মুক্ত বেণীর উজানে

জীবন বড় ছোট। কথাটা একসঙ্গে উচ্চারণ করলে, বড়-ছোটয় কেমন যেন মেশামেশি হয়ে যায়। অতএব 'বড়' বাদ, জীবনটা ছোট। আমি যখন বলি, কথাটা তখন আমার। কিন্তু কথাটা তো শুনেছি নানা ভাষায়, নানা স্বরে, সুরে। আজ অনেক ঘাট পেরিয়ে এসে, কথাটা আর মুখ ফুটে বাজতে চায় না। বাজনদারটি যে কে, তাকে দেখতে পেলাম না, চিনতে পেলাম না, আজ পর্যন্ত। কিন্তু কোথায় যেন সে নিরন্তর বাজিয়ে চলেছে, ছোট এ জীবন। ক্ষণস্থায়ী। নদীর স্রোতের প্রায়।

কথাটা কখন মনে হয়? কখন, কোন্ সময়ে ভিতর থেকে ধ্বনি দেয়? মানুষ যখন ভেজালের চালে চলে, তখন কী? জাল ভেজালেরই বা কী কথা। যার যেমন জীবন, সে তেমনি চালে চলছে। তা থেকে কেমন একটা সন্দেহ জাগে, ধ্বনিটা সবাই শুনতে পায় কী?

এ জিজ্ঞাসাতেও আবার গণতন্ত্রের আওয়াজ খেতে হবে না তো, অজানা অলক্ষ্যের ধ্বনি কারোর একলার ধন না। সবাই শুনতে পায়। তবে জোড় হস্তে নিবেদন, জিজ্ঞাসাটা তুলে নিলাম। রণমদে মত্ত হয়ে, ধরো কাটো মারো, একে করো তুক, ওকে কষো তাগ্, আপন স্বার্থে আজ তুমি ভালো, কাল মন্দ, নানা প্যাঁচ পয়জারের খেলায় বড় সুখের দর্পে লড়ছে। বহু কায়দায়, 'আমি' ছাড়া দুনিয়া নেই, 'ছোট এ জীবন'-এর ধ্বনি তুমি শুনতে পাও না, এমন উক্তি আর করবো না। বরং গণতন্ত্রের বক্রোক্তিটা নিজের কানেই কেমন খচ্ খচ্ করে বাজছে। চারদিকে এতো যে ছুটোছুটি লড়ালড়ি, জগত জুড়ে তুলকালাম কাণ্ড, সবই তো সেই ধ্বনির ধাক্কায়, ছোট এ জীবন। ক্ষণস্থায়ী। ত্বরায় চলো। তড়িঘড়ি চলো।

কথাটা মানুষের অবচেতনের ঢেউ কী না, বুঝতে পারি না। কিন্তু জীবন ছোট, অতএব, রাখো তোমার জীবন ধারণের খেলাখেলি, ভাঙবে সব জারিজুরি, যখন জুতবে বাঁধবে তোমাকে চারপায়ায়, নিয়ে যাবে শ্মশান খোলায়, রইবে না তো কিছুই বাকি, বৈরাগ্যের এ কথাটা কে মানতে পারে। যদিও বৈরাগ্যের এই বাণী আসলে মানব জন্মের এক দিকটাকে বারে বারে দেখিয়ে দিতে চায়, বৈরাগীর মতো আমি পারি না, সেই পথের পথিক হতে। একটা কথা, সংসারের আটপৌরে সীমানায় বলে, 'মরার বাড়া গাল নেই'। কথাটা শুনতে খাটো, আসলে মস্ত বড়। এমন অমোঘ কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ কিছু হয় না। আসল কথাটা বোধ হয় 'ধর্মে চলো'।

বলেও ফ্যাসাদ। ধর্ম আবার কাকে বলে? না, ধূপ দীপ জ্বালিয়ে, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে, ঠাকুরের দরজায় ঢিপ ঢিপ কপাল ঠোকার কথা বলিনি।

জীবন ধর্মের কথা বলেছি। কর্মের সঙ্গে ওটা জড়াজড়ি। 'কর্ম' কথাটা না বললেও চলে, জীবন ধর্মই আসল কথা। জীবন ধর্ম, জীবনলীলার নানা রঙে ছড়াছড়ি। এ জীবনলীলা একান্ত মানুষের, সেই কারণে মহত্তের মহান আবিষ্কার, দুর্লভ মানব জন্ম। অনিবার্য লয় তার মৃত্যুতে। যদি মানো, দুর্লভ এ মানব জন্ম, তবু কেউ হিসাবের অঙ্ক কষে গায়ে ছাপিয়ে দেয়নি, এ লীলার আয়ুষ্কাল কতোটা। আছে জীবন ধর্মে, তারই অভিজ্ঞতা, ছোট এ জীবন।

কথাটা নিয়ে অনেক বিলাপ, আক্ষেপ বিক্ষেপ শুনেছি। তবু কোথায় একটা ঠেক লেগে যায়। আমি যখন বলি, তখন কথাটা আমার। কিন্তু আমি যখন নেই, তখনও জীবন নিরবধি। চলমান বিশাল জীবনস্রোতকে ছোট বলি কেমন করে। জগত জুড়ে যার কূল নেই, সীমা নেই, অহর্নিশের সেই মহাজীবনকে নিজের একার সীমায় ধরা যায় না। বাঁধা যায় না। সেই কারণে কি, আমার তোমার ছোট জীবনের আর্তি, কিন্তু মানুষ থেকে যা: অমর ? মানুষ যদি অমর, তবে জীবন ছোট কেন ?

ছোট জীবনের সৃষ্টি লয়ে, অমর মানুষের ধারা অব্যাহত। কথাটা দৈব-বাণীর মতো বেজে ওঠেনি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটা ছবি যেন চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেতে দেখছি। মানুষ অমর, মানুষ অমর।

তবু সেই বাজনদারটি বাজিয়ে চলেছে, ছোট এ জীবন। ধর্মে থাকো। ত্বরায় বা মন্থরে, কাল তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তোমার লীলা তুমি কর। সাঙ্গ হবার দিনটির সূর্যোদয়ের হিসাব তোমার হাতে নেই। কথাটা ভাবলে কষ্ট হয়। মহামানব তো নই। পূর্ণতার প্রশ্ন জাগে, অথচ জানি, অপূর্ণতার ছায়া আমার পিছনে ঘুরছে। জন্ম মুহূ থেকে এই ছায়া আমার পায়ে পায়ে ফিরছে। সময় আমার হাতে নেই, সম: আছে ছায়ার হাতে।

তাই যদি, তবে বলি, থাক ছোট জীবনের কথা। শরিক হয়ে যাই অম: মানুষের চলমান ধারায়। ছোট জীবনের বিলাপ থেকে, দুর্লভ জন্মের রূপের সন্ধানে যাই। মরে যাই, কী মন প্রবোধের কথা ! দুর্লভ জন্মের রূপের সন্ধান। তবু যদি পথ চেনা থাকতো। অতএব, থাক সুলভ দুর্লভ জন্ম-রূপের সন্ধান। তার চেয়ে, চলো আপন পথে।

আপন পথেই চলেছিলাম। তার মধ্যেই ছোট এ জীবনের দার্শনিক তত্ত্ব বাখানি, আসলে একজন কানে তুলে দিয়ে গেল। শ্রবণ থেকে মনে, তারপ : যতো আন কথার ফুলঝুরি। চলেছিলাম গঙ্গার কূল ধরে উজান বহে। দূরে: পথে না, বলতে গেলে ঘরের আঙিনায়। বংশবাটি বলো, আর বাঁশবেড়ে, ে পাটকলের শেষ সীমানায় মোটর বাস, শেষ কয়েকজন যাত্রীকে নামিয়ে দি গেল। ফেরার পথে তুলে নিয়ে গেল অপেক্ষমান দুই চার যাত্রীকে।

রাস্তা শেষ, কাঁচা রাস্তার শুরু। বাঁদিকে বিঘা বিঘা পোড়ো জমি, জঙ্গলে ভরা। বড় গাছও কিছু কম নেই। মনে হয় যেন কোনো বড় বনের সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছি।

ডানদিকের ছবিটা একেবারে আলাদা। বিরাট লম্বা এক গুদাম ঘর, যার শেষ দেখা যায় না। গঙ্গাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। গুদাম ঘরের মাথার ওপরে টিনের ঢাকনাগুলো অর্ধচন্দ্রাকার। যেন বড় বড় ঢেউয়ের সারি। রাস্তার এদিকে কোনো জানলা দরজা নেই। তবু দেখছি, কেমন করে যেন টিনের দেওয়াল কেটে ছোট বড় ফোকর করা হয়েছে জায়গায় জায়গায়। তারই এক ফোকরে, দুই তরুণী কন্যার মুখ। বোধহয় সিঁথেয় কপালে সিঁদুরের চিহ্নও রয়েছে। আমার সঙ্গে তাদের চোখাচোখি হলেও তারা আছে তাদের মনে। কী যেন বলাবলি হচ্ছে, আর খিলখিল হাসি, মাঘের এই নরম রোদের নিরিবিলিকে ঝংকৃত করে তুলছে।

দু পা যেতেই আর একটি মুখ। আর এক ফোকরে। তরুণী বটে, কুমারী না সধবা বুঝতে পারছি না। গোল মাজা ফরসা মুখের বেশি দেখা যায় না। ডাগর চোখের দৃষ্টি আনমনা উদাস।

ঢেউ খেলানো টিনের চালা, বিরাট লম্বা গুদাম ঘরের ফাঁকে ফোকরে হাসি খুশি, উদাস গম্ভীর মেয়েদের মুখ। ব্যাপার কী ? বন্দীশালা নাকি ? ভিতর থেকে ভেসে আসছে নানা স্বরের বামাকণ্ঠ। তার মধ্যেই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, ঝগড়া-বিবাদের চিৎকার চেঁচামেচি। সবই স্ত্রী-স্বর। ঝগড়া-বিবাদের দু-চারখানি বিশেষণ যা কানে আসছে, কান ঝাঁকিয়ে ওঠার মতো। 'শতেক খোয়ারি' 'ভাতারখাগী' যদি বা উচ্চারণের যোগ্য বাকি কয়েকটিতে কেবল তোবা। তোবা। ভাষা যে ওপার বাঙলার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে এ রকম বিশাল গুদাম ঘর আরও অনেক জায়গায় দেখেছি। সেই সব গুদাম ঘরে মাল আছে কী না জানি না। মানুষ দেখিনি, নিঃসন্দেহে। তাও আবার কেবল স্ত্রীলোক। একটি সরু লম্বা ফোকরে দেখছি, মাথায় শাদা ধবধবে ছেলেদের মতো কাটা চুল, লোলরেখা বৃদ্ধার মুখ। শরীরের অংশ প্রায় চোখেই পড়ে না। আপন মনে বকবক করে চলেছে। আর গুদামের ঢেউ খেলানো চালের ওপরে বছর সাত আটেকের তিন চারটি ছেলে, এই মাঘের সকালে খালি গায়ে হনুমানের মতো লাফালাফি করছে। সারা গায়ে রোদ মাখামাখি। শীতের পরোয়া নেই।

ব্যাপারখানা কী ? জবাবের আশা নেই জানি। পথ চলতে অনেক ব্যাপার ঘটে, ঘটনা ঘটে অনেক। সে তো সামান্য কথা। জীবনেরই অনেক কথার জবাব খুঁজে পেলাম না। অতএব, নিরালা পথ চলতে, পথের মাঝে হঠাৎ এক মিলিটারি গুদাম বাড়ির টিনের দেওয়ালের ফোকরে ফোকরে তরুণী, বৃদ্ধার মুখ, ভিতর থেকে ভেসে আসা বামাস্বরের চিৎকার চেঁচামেচি, চালার

ওপরে খালি গায়ে ছেলেদের লম্ফঝম্ফ, কেন, কী বৃত্তান্ত তার জবাব না পেলেও চলবে।

গুদামের মাথা ডিঙিয়ে রোদ এখন আমার কাঁধে। চলার বেগটা কিঞ্চিৎ মন্থর হয়ে এসেছিল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কাঁচা রাস্তা ক্রমে নীচে নেমে চলেছে। কিছু এগিয়ে বাঁয়ে বেঁকে দূরে গিয়ে আবার ওপরে উঠেছে। ওপরের সীমানায় একটা বড় সাঁকোর লোহার বিম আকাশের গায়ে।

'নিখুঁজি, বুইতে পারলেন তো বাবু, নিখুঁজি। লতুন এয়েছেন ইদিক পানে, না?' ভাঙ্গা ভাঙ্গা সরু স্বরের বুলি শোনা গেল আমার বাঁদিকে।

ভুতের ভয় থাকলে, মাঘের এই সাত সকালেই কাছা খুলে দৌড় দিতাম। বাঁদিকে গাছপালায় নিবিড় খোলা পোড়ো জমির আশেপাশে আসশ্যাওড়ার জঙ্গল। বাস থেকে নেমে, পা বাড়িয়ে একটা লোকও চোখে পড়েনি। যে-দু-চারজন যাত্রী আমার সঙ্গে নেমেছিল, তারা যে কখন কোন্‌দিকে হাঁটা দিয়েছে, লক্ষ্য করিনি। রাস্তাটাকে একেবারে নির্জন বলা যাবে না। দূরে, বাঁদিকের নীচু খোলা মাঠে গরু চরাচ্ছে এক রাখাল পুরুষ। হাঁটুর ওপরে কাপড়, গায়ে একটা সামান্য জামা, মাথায় গামছা বাঁধা। তার কাছাকাছি একটি বউ আর এক বালিকা, গোবর কুড়োচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছিল, তারা সবাই অবাঙালী। পিছনে, পাটকলের শেষ সীমানায়, ছোট একটা চায়ের দোকান, একটা পান বিড়ির চালা ফেলে এসেছি। আমার আশেপাশে আর কেউ ছিল বা রয়েছে, দেখিনি। টেরও পাইনি।

মিলিটারি গুদামবাড়ির পাশ দিয়ে চলতে চলতে যখন আপন মনে চলছি আর ভাবছি, গুদামবাড়ির রহস্যের জবাব মেলার আশা নেই, তখনই হঠাৎ ভাঙা সরু স্বরের আওয়াজ। যেন নিজের ছায়াটাই অন্য সুরে কথা বলে উঠলো। অবাক চোখে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, খাটো রোগা একটি লোক। ময়লা লুঙ্গির ওপরে মোটা সুতির কাপড়ের একটা রঙচটা ময়লা চাদর। মাথার কালো চুল ছোট করে ছাঁটা। কিন্তু গোঁফদাড়ির বহর আছে। দেখলাম, গোঁফদাড়ির ফাঁকে বড় বড় হলুদ দাঁতে বিকশিত হাসি। বড় বড় চোখ দুটিও প্রায় হলদে। সরু নাক। সব মিলিয়ে আপাতদৃষ্টিতে ভারি নিরীহ। আমার বাঁয়ে, একেবারে পাশাপাশি নালা, দু এক কদম পিছনে। খালি পা দুটো ফাটা চটা। নখ কাটবার অবকাশ মেলেনি অনেক দিন, দেখলেই বোঝা যায়।

চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। তার প্রথম কথাটা ধরতে পারিনি, 'লতুন এয়েছেন ইদিকে, না?'

বুঝতে পেরেছি। সেই কথাটার জবাব দেবার আগেই, সে নিজেই আবার মাথাটা পিছনে একবার ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবু কি এই কলে কাজ করেন নাকি?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

'তাই ভাবি, বাবুকে তো এ তল্লাটে কখনো দেখিনি।' লোকটির বিকশিত দন্ত ঢাকা পড়ে না, চোখে অনুসন্ধিৎসা, 'তিরবেনীর বাবু হলে চিনতে পারতাম। বাবুর বাড়ি কি চুঁচড়োয়?'

আমি আবার মাথা নেড়ে বললাম, 'না তো।'

'চুঁচড়োর বাস থেকে নামতে দেখলাম, তাই ভাবলাম, চুঁচড়োর মানুষ।' লোকটির চোখে সেই একই জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসা। কালো গোঁফদাড়ির ভাঁজে, বড় বড় দাঁতের হাসি, 'কিন্তু মেয়ে নিখুঁজিদের আস্তানার দিকে বাবুর লজর দেখে ঠিক ধরেছি, এ তল্লাটে লতুন এয়েছেন।'

'মেয়ে নিখুঁজিদের আস্তানা' কথাটার মানে কী? লোকটার আপাদমস্তক একবার দেখে নিলাম। ভদ্রলোকের মনের প্রকৃতি, তার তো আবার নানান গতাগতি। লোকটাকে আপনি বলবো না তুমি, ঠেক লেগে যাচ্ছে। তবে, নিজের মান নিজের হাতে, আপনি সম্বোধনই রক্ষাকবচ। জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়ে নিখুঁজিদের আস্তানা মানে সেটা কী জিনিস?'

'নিখুঁজি, নিখুঁজি। নিখুঁজিদের কথা জানেন না বাবু?' লোকটির দাঁতে হাসি, হলদে চোখে অবাক জিজ্ঞাসা।

ভাববার অবকাশ কম। ঝটিতি মনে পড়বার মতো কথাও না। তবু কয়েক মুহূর্ত স্মৃতি হাতড়েও 'নিখুঁজি' শব্দ খুঁজে পেলাম না। অবাক চোখে একবার মিলিটারি গুদামশালার দিকে দেখে লোকটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'নিখুঁজি মানে? কাদের বলে?'

লোকটির দাঁত ঢাকা পড়লো না। জিভ দিয়ে একটা শব্দ করলো, মুখে অবাক হতাশা, 'নিখুঁজি বুইলেন না? পাকিস্থান থেকে যারা এয়েছে, নিখুঁজি।'

আমার মস্তিষ্কে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। পাকিস্থান থেকে যারা এসেছে। আমি বললাম, 'আপনি কি রিফ্যুজিদের কথা বলছেন?'

লোকটির চোখে মুখে গোঁফদাড়িতে, আর বড় দাঁতে হাসি আরও বিস্তৃত হলো। অনেকবার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই আপনারা বলেন— কী যেন বললেন? ওটা আমার আসে না, ত ঠিক ধরেছেন, এরা হল নিখুঁজি। আর এটা হল মেয়ে নিখুঁজিদের ক্যাম্প, গরমেন্ট রেখেছে।'

প্রাণ খুলে হাসতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু আমার হাসি লোকটির মনে অন্যভাবে বিঁধতে পারে। মনে মনে বললাম, 'আ মরি বাঙলা ভাষা।' রিফ্যুজি কেমন করে নিখুঁজি হয়, বোধহয় আচার্য সুনীতি চাটুয্যে মশায়েরও ঠেক লেগে যেতো। অনেক জেলায় র অ হয়, অ-তে র, কিন্তু রিফ্যুজি একেবারে নিখুঁজি, এমন উচ্চারণ এই প্রথম শুনলাম। আমার শব্দের ভাঁড়ারে, এটাকে নতুন সঞ্চয় বলতে পারবো কী না, বুঝতে পারছি না। কিন্তু ভাবছি, নিখুঁজি শব্দের একটা অর্থ করলেই বা ক্ষতি কী। যাকে খুঁজে পাওয়া যায়

না, বেপাত্তা, তাকেও নিখুঁজি বলে চালিয়ে দিলে কেমন হয়। সেই হিসাবে রিফ্যুজি আর নিখুঁজিতে তফাত তেমন দেখি না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা মেয়ে নিখুঁজিদের গরমেণ্ট এখানে রেখেছে কেন ?'

'কোথায় রাখবে বলেন।' লোকটির বড় বড় দাঁতে হাসিটি তেমনিই, 'এদের বাপ সোয়ামী কে কোথায় হারিয়ে গেছে, মরে গেছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। দেখভাল করার কেউ নেই। কারুর বড় ছেলেপিলে নেই, সব কাঁচকাঁচা। গরমেণ্ট এদের এনে এখানে ঠাঁই দিয়েছে। খাবার ডোল দেয়, জামাকাপড়ও দেয়। ভেতরে অফিস আছে, বাবু আছে—সরকারী বাবু। মেয়েমানুষ বলে কথা, বুইলেন কী না, বাইরে আসবার উপায় নেই। তবে মন বলে একটা কথা আছে, আছে না বাবু ?'

আমি লোকটির চোখের দিকে দেখলাম। হলদে চোখের খয়েরি তারায় কেমন একটা অর্থপূর্ণ ঝিলিক।

বললাম, 'তা, মানুষ মাত্রেরই মন থাকবে সে তো সত্যি কথা।'

'অই, সে-কথাটাই বলছিলাম। আমার মন করে আল্লা আল্লা, কে আগলায় দেউড়ি পাল্লা।' লোকটি নিরীহ হেসেই বললো, 'বাইরে আসবার মন করলে তাকে কেউ বেঁধে রাখতে পারে না।'

লোকটির চোখের অর্থপূর্ণ হাসির ঝিলিক বুঝতে পারলাম। আর একবার নিখুঁজি মেয়ে আস্তানার দিকে দেখে নিয়ে বললাম, 'কিন্তু বাইরে আসবার রাস্তা কোথায় ?'

'কেন বাবু, আস্তানার ও-ধারে গঙ্গা আছে না ?' লোকটির গোঁফদাড়ির ভাঁজে বড় দাঁতে হাসিটি তেমনই নিরীহ, 'লৌকোর ত অভাব নেই। রাতের আন্ধারে লৌকো ঘাটে লাগলেই হল। চোখে পড়ে, তাই বলি।'

আমি ইতিমধ্যে পা বাড়াতে আরম্ভ করেছি। বললাম, 'নৌকাবিলাস ?'

লোকটি ভাঙা সরু স্বরে হি হি করে হেসে উঠলো, 'জবর কথা বলেছেন বাবু, লৌকোবিলাস। তবে সহজে তো হবার জো-টি নেই। মেয়েছেলেদের নিজেদের মধ্যে এ বেলা সাঁট আছে তো ও বেলা নেই। একটু উনিশ বিশ হলেই ঝগড়া, তারপরে সাতকান হতে আর বাকি থাকে না। ক্যাম্পের বাবুর কানে কথা ওঠে, তখন বিচার মজলিস। সে সব আমরা দেখতে পাইনে। বিচারের ফলও জানিনে। তবে কানে আসে ঠিকই। চোখেই দেখেছি কয়েক-জনকে আস্তানা থেকে বের করেও দিয়েছে। তা না দেবে কেন বাবু ? পুরুষ নেই, সোয়ামী নেই, মেয়েমানুষের পেট বড় হয় কেমন করে ? নিখুঁজি মেয়েদের ক্যাম্প ত আজব কারখানা লয়, না কী বলেন বাবু ?'

আমি লোকটির চোখের দিকে আবার তাকালাম। সত্যি বলছে কি মিথ্যা বলছে, জানি না। কিন্তু গুরুতর ব্যভিচারের কথাগুলো নিজের ভাষায় এমন নিরীহ স্বরে বলছে কেমন করে ? চোখ বা মুখের দিকে তাকিয়ে তো মনে

হচ্ছে না, খোশ মেজাজে আমার সঙ্গে রসিকতা জুড়েছে। অবিশ্যি এমন কথার জবাব আমার কিছু ছিল না। মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এ রকমও হয় নাকি ?'

'হয়, মিছে কথা বলব কেন বাবু ?' লোকটি নিজের মতো করেই বললো, 'ত, সেও সেই কথা, গতর মনের গরজ বড় দায়, দোষই বা দেবেন কাকে ? গরমেণ্ট বলতে পারে, খেতে দিচ্ছি পরতে দিচ্ছি, পেটে তোমার জার কেন ? পথ দ্যাখ। বলা যায় অনেক কথা, পেটভাতায় ত সব দায় মেটে না, না কী বলেন বাবু ?'

আমি আবার মুখ ফিরিয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকালাম। হাসিটি একই রকম, একটু যা আনমনা। কিন্তু সরকারের নীতিতে সে বিশ্বাসী, না নিখুঁজি অনাথিনীদের ওপর তার সায়-সমবেদনা, সেটার ঠিক ধরতাই পাচ্ছি না। আমি কোনো জবাব দিলাম না। সে আবার নিজে থেকেই বললো, 'তবে হ্যাঁ, এও দেখি, খুঁজতে খুঁজতে কারুর সোয়ামী এসে হাজির হয়। মায়ের খোঁজে আসে জোয়ান ব্যাটা। সরকারের ব্যাওস্তা মতো আইবুড়ো মেয়েকে কেউ শাদী করে নিয়ে চলে যায়। শুনি গরমেণ্ট নাকি তাদের ঘর সোমসার করার জন্যে কিছু টাকা পয়সাও দেয়।'

এমন স্পর্ধা নেই, যে বলি, নতুন একটা মানুষকে দেখে, আর দুই চার বয়ান শুনলেই তার চরিত্র বুঝতে পারি। তবে লোকটি মুসলমান, এটা বুঝতে পারছি। তা ছাড়া, আমার কৌতুহল মেটাবার পক্ষে নিখুঁজি মেয়ে ক্যাম্পের একটি, প্রায় নিখুঁত চিত্র সে তুলে ধরেছে। ঠাট্টা বিদ্রুপ কতোটা আছে, জানি না। চিত্রটি ভালো মন্দ মিশায়ে সফলই। লোকটি জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে কপালে একবার হাত ঠেকিয়ে আবার বললো, 'আল্লার কী মর্জি দ্যাখেন, কোথাকার মানুষ, কোথায় এসে ঠাঁই নিয়েছে। ভিটে মাটি চাটি, বাপ সোয়ামী ভাই বেরাদার কে কোথায় মরেছে কি বেঁচে আছে, আর এরা এখানে পড়ে আছে। তকদিরের কম লিখন।'

আমি বললাম, 'আল্লার মর্জিতে তো কিছু হয়নি, হয়েছে নেতাদের মর্জিতে। তাঁরা দেশ কেটে ভাগ করেছেন।'

'তা বাবু, যাই বলেন, মর্জি আরজি সবই আল্লার, নইলে নেতারাই বা অমন কমমো করবে কেন। কার কী গুনাহ্‌, কে বলবে। যা হয়, সবই আল্লার মর্জিতে হয়।'

আমি লোকটির মুখের দিকে তাকালাম। গোঁফদাড়ির ভাঁজে, বড় দাঁতের হাসিটি এখন তেমন বিকশিত না, বরং একটু মন খারাপের ছায়া পড়েছে মুখে। আল্লার মর্জিতে তার অখণ্ড বিশ্বাস, কোনো সন্দেহ নেই। তবু মন খারাপ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার পাকিস্থানে যেতে ইচ্ছা করে না ?'

'তা কেন করবে বাবু ?' লোকটির দন্তবিকশিত হাসিতে যেন সংকটের

লক্ষ্মণ, 'সেখানে আমার কে আছে, কার কাছে যাব? আমাকে তো এখানে কেউ মেরে তাড়াচ্ছে না, তবে? বাপ চৌদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে, অচেনা দেশে যাব কেন? আল্লার যেন তেমন মর্জি না হয়।'

ন্যায্য কথা। জবাব দেবার কিছু নেই। আল্লার মর্জিতে আছে। সংসারের সব কিছুই যখন আল্লার মর্জিতে ঘটছে, তখন আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করাও বৃথা। যার বিশ্বাস আছে, তার সবই আছে। না থাকলেই পালটা জিজ্ঞাসা, খাসা যুক্তি তর্ক। এমন বিশ্বাস কেমন করে জন্মায়? এমন একটি বিশ্বাস আমি কেন পাই না? যেখান থেকে আমাকে কেউ টলাতে পারবে না। ছুটিয়ে বেড়াতে পারবে না।

আমি সামনের দিকে তাকিয়ে চলেছি। কিন্তু টের পাচ্ছি, লোকটি আমার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। কোথায় যাবে, কে জানে। আমার লক্ষ্য আপাতত ত্রিবেণী। যাত্রা, গঙ্গার কূলে কূলে, উত্তরের উজানে। ত্রিবেণীতে একটু ঠেক দিয়ে যাওয়া।

'বাবু কি গাজীসাবের মজ্জিদ দেখেছেন নাকি?' লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

গাজীসাহেবের মসজিদ? আমি লোকটার দিকে ফিরে তাকালাম। কেতাবের কিছু অক্ষরমালাও যেন মগজে দেখা দিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় সে মসজিদ?'

'ঐ যে, ঐ ত দেখা যায়।' লোকটি বাঁ হাত তুলে, বাঁদিকে দেখালো, 'এই যে আপনার বাঁদিক দিয়ে রাস্তা ওপরে উঠে গেছে।'

দাঁড়িয়ে বাঁদিকে দেখলাম। বাঁদিকে উঁচু ঢিবির ওপরে পায়ে চলার রাস্তার দাগ উঠে গিয়েছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কালো পাথরের ইমারত আর একাধিক গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। আমি বাঁয়ে পা বাড়ালাম। লোকটিও আমার সঙ্গ নিল। খুশির স্বরে বললো, 'তাই ভাবি, বাবু নতুন মানুষ এয়েছেন গাজীর মজ্জিদ না দেখে যাবেন কেন?' এমনিতেই কতো লোকে আসে।'

চারপাশে ঘন গাছপালায় নিবিড়। দোয়েল টুনটুনি বুলবুলির ডাকাডাকি। কাঠবেড়ালীর হুটোপুটি দৌড়োদৌড়ি ভুঁয়ে আর গাছের ডালে।

'গাজীসাব মোচলমান হলেও, গঙ্গা মায়ের পুজো করতেন।' লোকটি বললো।

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে, ওপরে উঠতে লাগলাম। নীচের রাস্তা থেকে উঁচু কম না। লোকটির কথায় মাথা ঝাঁকালেও আমার মনে এখন কেতাবের খবর। মসজিদের উঠোনে পা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ তো জাফর খাঁ গাজীর সমাধি?'

লোকটির গোঁফদাড়ির ভাঁজে, বড় বড় দাঁতের হাসির থেকেও অবাক খুশির হাসি যেন নতুন করে ছড়িয়ে পড়লো। 'বাবু তো সবই জানেন দেখছি। তবে যে না দেখেই চলে যাচ্ছিলেন?'

বললাম, 'এখন দেখে মনে পড়লো, বইয়ে পড়েছি। আমি ভেবেছিলাম এ মসজিদ ত্রিবেণীতে।'

'ত বাবু এও ত ত্রিবেণীই।' লোকটি বললো, 'তবে সমাধির কথা যা বললেন, ঐ-ঐযে ঐটা।' সে আমাকে সামনের কবরটি দেখিয়ে বললো, যার ওপরে লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা, 'মজ্জিদটা বানিয়েছিলেন উনি। এ হল বাবু, হিঁদু মোচলমানের মজ্জিদ। দ্যাখেন, মজ্জিদের গায়ে হিঁদু মন্দিরের কাজ আছে।'

আমারই ভুল। সমাধি আর মসজিদ আলাদা। মসজিদের উঠোনের এদিকে ওদিকে কয়েকটি পাথরের বড় টুকরো ছড়ানো। সাধারণ পাথর না, তার গায়েও কিছু অস্পষ্ট শিল্পের কাজ আছে। বোধহয়, আর দরকার হয়নি বলে, এমনি পড়ে আছে। মসজিদের মাথার ওপরে পাঁচটি ডোম। ভালো কথায় গম্বুজ। তবে গম্বুজ বললে যেমন বড় সড় বুঝায়, তেমন না। ডোম বললেই যেন মানায়। কয়েকটি থামে আর দেওয়ালে, হিন্দু মন্দিরের নরনারীর মূর্তি। দেবদেবীদের তেমন চেনা যায় না। হিন্দু বৌদ্ধ, যে-কোনোরকমই হতে পারে।

আমরা জানি, মুসলমান নবাব বাদশা যোদ্ধারা হিন্দু মন্দির কেবল ধ্বংসই করেছে। আর কোথাও এমনটি আছে কিনা জানি না, এখানে দেখছি, কোথাকার হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে, মসজিদের কাজে লাগানো হয়েছে। জাফর খাঁ গাজীর মনের অন্ধিসন্ধি জানবার উপায় নেই। মহাশয়ের কি গুনাহ্-এর ভয় ছিল না? আল্লার দেওয়া আক্কেলটা তাঁর একটু ভিন রকম ছিল। না হলে, হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের শিল্প খোদাই করা পাথর দিয়ে মসজিদ নির্মাণ? তোবা তোবা! এমন মিলমিশের কারণ কী?

একটি খিলানের মিহরাবে আরবি বা ফারসিতে কিছু লেখা আছে। ঐতিহাসিক তা থেকেই নির্মাণের বছরের হিসাব পেয়েছেন। বারোশো আটানব্বুই খ্রীষ্টাব্দ। প্রায় সাতশো বছর হতে চলেছে, কিন্তু কালের থাবা যেন তেমন করে দাগ বসাতে পারেনি। জাফর খাঁকে বলা হয়েছে সপ্তগ্রাম বিজেতা। অন্য দিকে, পাণ্ডুয়া বিজয়ী শাহ সুফির খুড়তুতো ভাই। পায়ের স্যাণ্ডেল খুলে রেখে, মসজিদের মাঝখানের প্রবেশ পথ দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। জনা তিন চারেক বাচ্চা ছেলে, হঠাৎ এপাশ ওপাশ থেকে দৌড়ে ছিটকে, কোন্‌খান থেকে বেরিয়ে এসে আমার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। চমকেই উঠেছিলাম। লোকটি আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। কাকে যেন ধমকে দিয়ে উঠলো, 'হে, হেই তুরকা, ইস্কুলে যাসনি?'

কোনো তুরকারই জবাব শোনা গেল না। এমন নামও কখনো শুনিনি। মসজিদের ভিতরে ভেজা আর প্রাচীনের একরকম গন্ধ নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'চেনেন নাকি?'

'ওদের মধ্যে একটি আমার ছেলে।' লোকটি হেসেই বললো, 'দ্যাখেন, বেলা কতখানি হল, ইস্কুলে যাবার নাম নেই, এখানে খেলে বেড়াচ্ছে। ছেলেগুলানও সব আমাদের পাড়ার।'

মসজিদের ভিতরে কিছু দেখবার নেই। বেরিয়ে এসে পিছন দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে পাড়া আছে নাকি?'

'আছে বাবু, ঐ দিকে।' লোকটি আমাকে উত্তর পশ্চিমের কোণে হাত তুলে দেখালো, 'আমরা কয়েক ঘর আছি, এ মজ্জিদেই নেমাজ পড়ি। আমরাই ঝাঁট পাট দিয়ে সাফ সুরত করি। গরমেন্ট কিছু সামান্য দেয়। আর এই আপনাদের মতন কেউ এলে, কবরথানে কিছু দিয়ে থুয়ে যান। ঐ ভাগ বাঁটোয়ারা করে যা পাওয়া যায়।'

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝির কথা। সরকারের সংরক্ষিত বিষয়ক কোনো বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়েছিল বলে মনে করতে পারি না। পিছন দিকে, মসজিদের শেষে আর জমি নেই বললেই চলে। তবু একটি যাওয়া আসার পথ আছে। পিছনের ঢালুতে ঘন জঙ্গল, লতায় পাতায় মোড়া। সেখান থেকে উত্তরে মাঠ চোখে পড়ে। উঁচু নীচু কাঁচা রাস্তা আর লোহার তৈরি ঝোলানো সাঁকো। সাঁকোটা কি সরস্বতী নদীর ওপরে? তাই হবে। ইতিহাসের কথা মনে পড়ে গেল। জাফর খাঁ গাজী নাকি এই মসজিদটি তৈরি করেছিলেন, সরস্বতী আর গঙ্গার সঙ্গমস্থলে। এখন আর সে-গঙ্গা নেই, যদি বা মনে হয়, চর পড়া ছাড়া, এদিকে গঙ্গা তার খাত বদলায়নি। সরস্বতীও না। তবে দূরে স্রোতস্বিনী রেখাটি দেখে অনুমান হয়, কায়া তার ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হয়েছে। রাস্তার নীচে বাঁদিকে যে-মাঠে এখন গরু চরে বেড়াচ্ছে, সেই মাঠে হয়তো একদা সরস্বতীর ঢেউ খেলতো। তার এ পারের বিস্তৃতি ছিল হয়তো এই মসজিদের কাছেই। সেই হিসাবে গঙ্গা সরস্বতীর সঙ্গম বলা চলে। কিছু দক্ষিণে গেলে, যমুনার মরা গাঙ দেখা যায়। সেই হিসাবে, ত্রিবেণী সঙ্গম নিঃসন্দেহে। তবে, সরস্বতী এখানে গুপ্ত নন, যেমন আছেন প্রয়াগ সঙ্গমে। প্রয়াগ হল গুপ্ত বেণী। বাঙলার ত্রিবেণী মুক্ত বেণী। তারও অবিশ্যি ব্যাখ্যা আছে। প্রয়াগে তিন ধারার মিলন ঘটেছে, এখানে এসে ছাড়াছাড়ি। এখানে এসে তিন কন্যার তিন দিকে পৃথক ধারায় যাত্রা। গুপ্ত মুক্ত যা বলো, তীর্থ-ক্ষেত্রের এই হল মাহাত্ম্য।

চোখের সামনে পুরনো দিনের একটা ছবি যেন ভেসে উঠছে। চারশো বছর আগে, গঙ্গার সঙ্গে সরস্বতীর যোগাযোগ নাকি একটি খাল কেটে করা হয়েছিল। সেই খালই বড় হয়ে, 'কাটি গঙ্গা' নাম হয়েছে। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে এখন, গঙ্গা থেকে পশ্চিমগামিনী শীর্ণ রেখাটি দেখতে পাচ্ছি, সেটা বারোশো আটানব্বুই খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন 'কাটি গঙ্গা'-এর কথা কেউ জানতো না। দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দেই ধোয়ী কবির 'পবন দূতম্'-এ ত্রিবেণীর

গুণগান শুনেছি। দিল্লির মুঘলদের আগে, গৌড় বঙ্গে পাঠান সুলতানদের রমরমা। বিপ্রদাস বা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম কিছু আগে পরের কথা।

আমার চোখের সামনে যে ছবিটা ভেসে উঠছে, সেটা কেবল মুক্ত বেণীর সঙ্গমে তীর্থযাত্রার স্নান কোলাহল না। ত্রিবেণী, আদি সপ্তগ্রামের থেকেও যেন বড়, বিশাল এক বন্দর। সরস্বতী আর গঙ্গার বুক জুড়ে, হাজার জলযানের মাস্তুল ঠেকে আছে আকাশে। হাজার মানুষের কাজের ব্যস্ততা। সমুদ্রগামী বিশাল নৌকায় মাল খালাস আর ভরতির দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি হাঁক-ডাক। যদি বলি, সেটা মুসলমান আমলের প্রারম্ভ, তা হলেও দূরদেশী সওদাগর আর নাবিকদের ভিড়ও কম না। তারপরে ছবিটা আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকে। গৌড়ের পাঠান আমল মুঘলদের কাছে মার খাচ্ছে। ফিরিঙ্গিদের ভিড় বাড়ছে। তাদের সঙ্গে আসছে তখনকার জাহাজ। যার উঁচু মাস্তুলে মাস্তুলে ত্রিবেণীর আকাশের চেহারা গিয়েছে বদলে। জন-জনতার চেহারাতেও রঙ বদলের পালা। ঘুরে গিয়েছেন আগেই, তখন প্লিনি, টলেমি, উইলিয়াম হেজ্ আর স্ট্রাভোরিবাসের যুগ।

কবিকঙ্কন পূর্ব স্মৃতিচারণের কাব্য লিখছেন। কেউ লিখছেন চণ্ডীমঙ্গল, কেউ চাঁদ সদাগরের উপাখ্যান। রামায়ণ মহাভারতও যদি নেই। গৌড়ের বাদশাহী আমল থেকেই তার শুরু। রাধাকৃষ্ণের যৌবনলীলা, আর সেই সঙ্গে শক্তি উপাসনার তন্ত্র ব্যাখ্যা। কিন্তু ত্রিবেণীতে তখন সমুদ্রগামী জাহাজ নোঙর করেছে যারা, তারা সবাই ভিনদেশী। তারা ত্রিবেণীকে কেউ বলে 'তিরপানি' 'তারাবানি' একসময়ে 'ফিরোজাবাদ'।

এখানে এসে পৌঁছুবার আগেই পেরিয়ে এসেছি সাগঞ্জ। ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওসমান সা যখন বাঙ্গলার শাসনকর্তা, তখন নাকি সেই ক্ষুদ্র জায়গাটি তাঁর নজর কাড়ে। কারণ, সেখানে একটি বড় গঞ্জ ছিল। অতএব, নাম বদল হোক। হল, সা আজিমগঞ্জ। পরে, লোকের মুখে মুখে, কেবল সাগঞ্জ।

তারপরে এই ত্রিবেণী। যেখানে ছিল সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র, টোলে আর টোলো পণ্ডিত আর ছাত্রে ছাত্রে ছয়লাপ, সেখানে বিশাল বন্দরের আবির্ভাব। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাল আরও অনেক পরে। তখন 'পবন দূতম্'-এর কাল গত, পাঠান মুঘল রাজ্য ছাড়া। ফিরিঙ্গিরা কলকাতায় গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। দেশ জোড়া তাদের শাসন। ত্রিবেণী এখন কেবল এক তীর্থ, আর মহাশ্মশানের আগুনে লকলক জ্বলছে। মহাশ্মশান! তার চিতার আগুন তো কখনও নেভে না।

পুরনো দিনের একটা ছবি না, অনেকগুলো ছবি চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে, এখন মফস্বলের শহর হয়ে ওঠার একটা আপ্রাণ চেষ্টা মাত্র ভাসছে। কোনোকালেই যে আধুনিক শহর হয়ে উঠবে না, অথচ গ্রামের রূপ নিয়ে নিরিবিলিও থাকতে পারবে না। সে তার পুরোনোকে ফিরে পাবে না,

নতুনের এক শ্বাসরুদ্ধ-সামান্য ব্যবসাকেন্দ্র, চাপা গলি, ঘিঞ্জি বাড়ি, নিয়ম-নীতিবিহীন আর পাঁচটা মফস্বল ছোট শহরের মতোই পাঁচমেশালী একটা দলা পাকানো চেহারা। সেই সঙ্গে তীর্থক্ষেত্রের ভালো মন্দ যা থাকা উচিত, যা ছড়িয়ে আছে আমাদের গোটা দেশ জুড়ে, তার সবই আছে। এমন কি নেই, মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের যুগও।

কেতাবের হক কথাতেই প্রমাণ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো শ্রুতিধর জগতে এক বিনা দুইয়ের উদাহরণ নেই। সংস্কৃতের পণ্ডিত, ইংরেজির নামগন্ধ জানতেন না। ঘাটে স্নান করছিলেন। নৌকোয় তখন দুই গোরা সাহেব তাদের মাতৃভাষায় বচসা চালিয়েছে। বচসা থেকে মারামারি। তার জের গিয়ে উঠলো আদালতে। কিন্তু সাক্ষী কোথায় পাওয়া যায়? ডাক পড়লো জগন্নাথ পণ্ডিতের। ইংরেজি না জানুন, দুই সাহেবের সব কথা শ্রুতি আর স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন। আদালতে দাঁড়িয়ে, দুই সাহেবের ইংরেজি বুকনির বচসা সব গড়গড় করে বলে গেলেন। বিচারক সাহেব 'মাই গড' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কী না, সে-সংবাদ জানা নেই। কিন্তু আদৌ ইংরেজি না জানা একজনের মুখে, অবিকল ইংরেজি ঝগড়ার বুলি শুনেই, বিচারককে রায় দিতে হয়েছিল।

'বাবু।'

ডাক শুনে পিছন ফিরে তাকালাম। সেই লোকটি। গোঁফদাড়ির ভাঁজে, এখন তার বড় দাঁতের হাসি প্রায় নেই। হলদে চোখের খয়েরি তারায় তার অবাক উৎসুক জিজ্ঞাসা। আমি তার দিকে ফিরে তাকাতে, সে তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা সরু অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবু, আপনি কী দেখছিলেন?'

লোকটির কাছে লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু অনেকক্ষণ এক মনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, সেই কারণে তার অবাক হওয়ায়, আমার অস্বস্তি। বললাম, 'জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ থেকে ত্রিবেণীকে দেখছিলাম।'

'এতক্ষণ ধরে?' লোকটির গোঁফদাড়ির ভাঁজে বড় বড় দাঁতের হাসিটি আবার বিকশিত হল, 'আমি ভাবি, বাবু এত কি দ্যাখেন? জপ কয়েন না, তপ করেন, নাকি চোখ দিয়ে জমি জরীপ করেন? তারপরে ভাবি, যে মাঠে গরুগুলোন চরছে, তার মধ্যে চোরাই গরু খোঁজেন নাকি।'

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে বললাম, 'চোরাই গরু? তার মানে?'

'ঐ ওদের বিশ্বাস নেই বাবু, ঐ বিহারীদের কথা বলছি।' লোকটি মাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'সাঁকোর ওপরে থেকেও গেরস্তের গরু নিয়ে এসে, নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়। খোঁজ পড়ল ত ভালো, নইলে গেল। এ নিয়ে কতো বিবাদ কাজিয়া, লাঠালাঠি বলা যায় না। তাই একবার ভাবলাম, বাবু বোধহয় ত্রিবেণীরই লোক হবেন, চিনতে পারিনি। চোরাই গরুর খোঁজ করছেন দূর থেকে।'
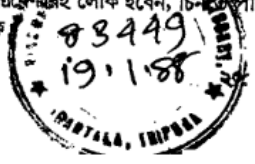
উদ্গত উচ্ছ্বসিত হাসিটাকে ঢোক গিলে হজম করলেও, অতঃপরেও রামগড়ুরের ছানা হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। হাসতে মানাও ছিল না। লোকটিকে একেবারে বেয়াকুফ বানাবার ইচ্ছাটাকে দমন করে, অল্প হাসলাম। ওকে আমার দোষ দেবারও কিছু নেই। ভাবতে হয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত। জপ তপ জমি জরিপ থেকে চোরাই গরুর সন্ধান। যতোটা ভাবতে পেরেছে, ততোটাই বলেছে। বলেনি কেবল একটা কথাই, আমাকে ভুতে পেয়েছে কী না। মনে মনে ভাবলেও, মুখে অন্তত বলেনি।

বললাম, 'না, ত্রিবেণীর লোক হলে আগেই বলতাম। তা, এরা গরু নিয়ে এ রকম করে নাকি?'

'মিছে বলব কেন বাবু? এ তল্লাটে যাকে জিগেস করবেন, সেই বলবে, গেরস্তের গরু ভাগাতে এরা ওস্তাদ।' লোকটির স্বরে এই প্রথম কিঞ্চিৎ বিক্ষোভের সুর বাজলো। তারপরেই আবার অবাক হাসির আসল স্বরে বললো, 'আমি ভাবি, বাবু এত কী দ্যাখেন, এত কী ভাবেন? ভেবে আর কোন কুল কিনারা পাইনে। কী করে বুঝব বাবু আপনি এখান থেকে এক মনে এক নজরে কেবল ত্রিবেণী দেখছেন।'

আমি পিছন ফিরে আবার মসজিদের সামনের দিকে এলাম। লোকটি আছে সঙ্গেই। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে রোদ। মাঘের বাতাসে তেমন জোর নেই। বহুকালের পুরনো স্মৃতিসৌধ, যার গায়ে হিন্দু মুসলমানের শিল্প একাকার হয়ে আছে। পাখির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। ঝিঁঝিঁর ডাক নৈঃশব্দ্যেরই অন্তরঙ্গতায় যেন ডুবে আছে। আমারই বা তাড়া কিসের? পায়ে স্যাণ্ডেল গলিয়ে দক্ষিণে সরে এসে, একটি পরিত্যক্ত পাথরের ওপর বসলাম। চলে যাবার আগে একটু এই প্রাচীন মসজিদের নির্জনতাকে কেবল মন দিয়ে না, শরীর ভরে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে সিগারেট খেলে দোষ নেই তো?'

'বাবুর কী কথা!' লোকটির সারা মুখ থেকে হাসি ছড়িয়ে পড়লো যেন রঙ চটা ময়লা চাদর জড়ানো সারা গায়ে। আমার দু হাত দূরে মাটির ওপরে লুঙ্গি গুটিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে বললো, 'আপনি তো আর মজ্জিদের মধ্যে খাচ্ছেন না। মাজারের গায়ে ঠেশ দিয়েও বসেননি। কত বাবুরা আসেন, ওসবও মানেন না। এই শীতকালে, ছুটিছাটার দিনে, বাবুরা চড়ুইভাতি করতে আসে, তারাও নিয়মকানুন মানে না। আপনি এখানে বসে সিগারেট খাবেন না কেন?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'চড়ুইভাতি কোথায় করে? এই উঠোনেই নাকি?'

'না না।' লোকটি মাথা নেড়ে জিভ কাটলো, 'তা কেউ করে না।

আশেপাশে অনেক জায়গা রয়েছে। পশ্চিম দক্ষিণের জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় চড়ুইভাতি করে।'

এখানেও চড়ুইভাতি। বনভোজনের জায়গা দেখছি সবখানেই। বন যখন আছে, তখন ভোজের অনুষ্ঠানে বাধা কী? কিন্তু এই মসজিদ আর সমাধির আশেপাশে, মানুষের বনভোজনের হৈ হল্লাটা ভেবেই কেমন অস্বস্তি লাগে। একদা হয়তো এই চত্বরে অনেক ভিড় থাকতো। ত্রিবেণী বন্দরের অনেক ফিরিঙ্গি দেখতে আসতো। হিন্দুরা নিশ্চয় দূরেই থাকতো। এখন সে ত্রিবেণী নেই। মসজিদটিও নেই গঙ্গা সরস্বতীর সঙ্গমে। গাছপালা বনের আড়াল, একলা নিরিবিলি। এখন এই অনর্গল, গাছে গাছে বনের ঝোপে পাখির ডাকই সব থেকে মানানসই।

সিগারেটটা ধরিয়ে, দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলতে গিয়ে লোকটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। নিজেকেই কেমন অভব্য মনে হল। সেই নিখুঁজি মেয়ে ক্যাম্পের সংবাদ দেওয়া থেকে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার সিগারেট চলবে?'

'দ্যান একটা।' বলতে গিয়ে, গোঁফদাড়ির ভাঁজে হাসিটি ভারি লাজে লাজানো হয়ে উঠলো। গায়ের চাদরটিও অকারণ একটু টেনে টুনে নিতে হল।

আমি একটি সিগারেট আর দেশলাই তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে ঝুঁকে পড়ে দু হাত পেতে নিল, 'ত, বাবু আমাকে আর আপনি আপনি করবেন না। বড় লজ্জা করে।'

লজ্জাটি যে অকৃত্রিম, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'নাম কী?'

'এমদাদ আলি খাঁ', বলতে গিয়েও যেন লাজিয়ে উঠলো, 'বাপ ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি আমাদের সঙ্গে নাকি গাজীসাবের রক্তের সম্পর্ক ছিল।'

তার মানে জাফর খাঁ গাজীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক! সংসারে তো অসম্ভবের তুলনা নেই। দিল্লিতে যদি মুঘল বংশধর এখন টাঙাওয়ালা হতে পারে, বাংলাদেশের সামান্য একজন গ্রাম্য গরীব চেহারার মানুষটির শরীরে জাফর খাঁ গাজীর রক্ত থাকতেই পারে। বইয়ের পাতায়, জাফর খাঁ গাজী সপ্তগ্রাম বিজেতা। তাঁর বাসস্থানও নিশ্চয় সেখানেই ছিল। মসজিদটি কেন এইখানে করেছিলেন, সেই মর্জির কথা জানা যায় না। এমদাদ আলি খাঁয়ের বংশধরেরাও হয়তো এককালে সাতগাঁয়ে ছিল। তারপরে ত্রিবেণীর মসজিদের কাছে এখন পর্ণকুটিরে।

এমদাদ আলি খাঁ সিগারেটটা ধরিয়ে, ধোঁয়া ছাড়বার মুখে কী একটা উচ্চারণ করলো। দেশলাইটি বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমি দেশলাই নিলাম, আর সে মুখ খুললো, 'তবে বাবু, আপনি যে বললেন জাফর খাঁ

গাজী, আবার ওঁয়ারই নাম কিন্তু দরাফ গাজী। উনি গঙ্গা মায়ের পুজো করতেন। অনেক মন্তর তন্তর জানতেন।'

আবার আমার মনে পড়লো কেতাবের কথা। কিন্তু ত্রিবেণীর দরাফ গাজী আর সপ্তগ্রামের জাফর খাঁ গাজী এক ব্যক্তি কী না, তা আমার জানা নেই। জাফর খাঁ মন্তর তন্তর জানতেন কী না জানি না, দরাফ গাজী কী জানতেন তাও জানি না। তবে দরাফ গাজী গঙ্গাস্তোত্র লিখেছিলেন, কেতাবে এমন কথা আছে।

'বাঁশবেড়ের খামারপাড়া চেনেন তো বাবু?' এমদাদ আলি খাঁ আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

'ত শোনেন বলি।' এমদাদ সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ঢোক গিললো, ধোঁয়া ছাড়লো আস্তে আস্তে। অনেকটা গঞ্জিকা সেবনের মতো। বললো, 'সেখানে এক আখড়া ছিল, বাবাজীর নাম ছিল ভিখিরিদাস। ত, সেই ভিখিরিদাসের সঙ্গে গাজীসাহেবের কেমন একটা আড়াআড়ি ভাব ছিল। কেউ কারু কাছে মাথা নোয়াতে চাইতেন না। তা, একদিন কী হল। গাজীসাব একদিন ভোরবেলা এক বাঘের পিঠে চেপে, ভিখিরিদাসের আখড়ায় গিয়ে হাজির। ভিখিরিদাস তখন দাওয়ায় বসে দাঁত মাজছিলেন। গাজী ভেবেছিলেন, বাবাজী ভয়ে পালাবেন।' এমদাদ হাসতে হাসতে সিগারেটে একটা টান দিয়ে নিল, 'পালানো ত দূরের কথা, বাবাজী দাওয়ায় চাপড় মেরে বললেন, 'দাওয়া এগিয়ে যা।' যেমন বলা তেমনি কাজ, দাওয়া এগিয়ে গেল বাঘের পিঠে গাজীর সামনে। তখন দুজন দুজনকে চিনলেন। একজন নামলেন বাঘের পিঠ থেকে, আর একজন দাওয়া থেকে। তারপরে দুজনের সে কি জড়াজড়ি গলাগলি পিরীত। ইনি বলেন, তোমাকে দেখি। তিনি বলেন, তোমাকে দেখি। আসলে, ব্যাপারটা কী বুঝলেন ত বাবু?'

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না বটে, তবে এমন একটা কাহিনী কেতাবে পড়েছি মনে হচ্ছে। এমদাদের ভাষায় একটু অন্যরকম শোনাচ্ছে, এই যা। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

'আসলে দুজনের মধ্যে আঁতান্তর ছিল না, মনে পেরাণে এক মানুষ।' এমদাদের হলদে চোখে রহস্যের ঝিলিক, 'আর এটা হল, দুজনকে দুজনের একটু বাজিয়ে দেখা, বুঝলেন না?'

তা বুঝলাম। কিন্তু সেই প্রায় সাতশো বছর আগে, হিন্দু মুসলমানের এত জড়াজড়ি গলাগলি পিরীতের কারণ কী? দরাফ গাজী আর জাফর খাঁ গাজী একই ব্যক্তি কী না, হলফ করে বলা দায়। কারণ ইতিহাসের বয়ান তেমন স্পষ্ট না। 'কথিত আছে, ইঁহারা উভয়েই নাকি একই ব্যক্তি' ইতিহাসের বয়ানটা এইরকম। 'কথিত আছে' আর নাকি কেমন একটা অস্পষ্টতায় ঢাকা।

আর জড়াজড়ি গলাগলির এমনই মাহাত্ম্য, গাজী সাহেব গঙ্গাস্তোত্র রচনা করে ক্ষান্ত হননি, নিয়মিত গঙ্গাপুজোও করতেন।

ভিখিরিদাস আর গাজীসাহেবের ঘটনা, যবন হরিদাসের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু গৌড়ের পাঠান আমলের সেই ইতিহাস তো কামারের নেহাইয়ে হাতুড়ির ঘা। যবন হয়ে হিন্দু নিমাই পণ্ডিতের ভক্ত শিষ্য, বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ! কাজীর বিচারে তাই হরিদাসকে বাইশবাজারে, বেত দিয়ে পেটানো হয়েছিল। তা ছাড়াও ছিল হিন্দুর জাতি মারার নানান কৌশল। অথচ তার প্রায় দুশো বছর আগেই যবন গাজীর গঙ্গাপুজো, মনে কেমন ধন্দ লাগিয়ে দেয়। দরাফ যদি জাফর হন, তবে তাঁর পরিচয় সপ্তগ্রাম বিজেতা। স্বয়ং বাদশার ওপরে তো কাজীর বিচার চলে না। কিন্তু পাণ্ডুয়া বিজয়ী শাহ সুফিও খুড়তুতো ভাইটিকে কিছু বলেননি? কেন? গঙ্গার স্রোতে তখন তা হলে জাত বিজাতের ভক্তির শক্তি ছিল।

'আরো একটা কথা কি জানেন বাবু?' এমদাদের নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো, 'গাজীসাবের এক ছেলে হুগলির এক হিঁদু রাজার মেয়েকে শাদী করেছিল। তা সেই মেয়েও এখেনেই আছেন।'

ইতিহাসের অক্ষরমালা মাথায় পাক খেলেও, ঠিক মনে করতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে আছেন মানে?'

'এঁজ্ঞে, তাঁকে এখেনেই গোর দেওয়া হয়েছে।' এমদাদ হাত তুলে পশ্চিমে দেখালো, 'ঐ যে, ঐখেনে উনি আছেন।'

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, পশ্চিমের ছায়ায় ঝোপঝাড়ের কাছাকাছি আর একটি ছোট সমাধি। দেখতে গিয়ে চোখে পড়লো, সেই কুচোকাঁচা ছেলেগুলো, ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে আমাদের দিকেই দেখছিল। মুখ ফেরাতেই চড়ুই পাখির মতো ঝুপঝাপ আড়ালে চলে গেল। এমদাদের তুরাক আজ আর ইস্কুলে যাবে না। কিন্তু এমদাদ দেখেও কিছু বললো না, বা তাড়া দিল না। এখন তার মনের গতি অন্য দিকে। তুরাকের ইস্কুলে না-যাওয়া নিয়ে আমার চোখে ভ্রূকুটি নেই। বরং নিজের ছেলেবেলাটা মনে করে, হাসছে আমার অন্তর্যামী। সেই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস। ঐ দিনগুলো আর এ জীবনে ফিরে পাবো না।

'তা, বাবু, আজ মাঘ মাসের কত তারিখ হল?' এমদাদ তার বুড়ো আর মধ্য আঙুলে, বলতে গেলে সিগারেটের অঙ্গার ধরে টান দিয়ে, মাটিতে ফেললো। লোহার আঙুল না নিশ্চয়ই, কিন্তু আঙুল দিয়ে টিপেই আগুন নিভিয়ে ছাই করে দিল। হলদে জিজ্ঞাসু চোখ আমার দিকে।

ধর্মান্তরিত হিন্দু রাজকন্যের গোর দেখিয়ে, তারপরেই মাসের দিন তারিখের খোঁজ খবর কেন? বিপদে ফেললো আমাকেও। মাঘ মাস জানি, তারিখের হিসাব তো জানা নেই। বললাম, 'তা তো বলতে পারি না।'

এমদাদ তখন নিজেরই আঙুলের কর গুনতে আরম্ভ করেছে, আর গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে কালো ঠোঁট নড়ছে। তারপরে হঠাৎ বড় দাঁতে হেসে বললো, 'আমিও হিসেব পাচ্ছিনে। তা, সে যাই হক গে, বলছিলাম, মাঘী পুন্নিমেয় সবাই ত্রিবেণীতে নাইতে আসে ত, খুব ভিড় হয়। ত, ইদিককার যত সাবেক দিনের হিঁদু আছে, সব্বাই এই মজ্জিদে একবার আসবে। কেবল মাঘী পুন্নিমেয় নয়, ত্রিবেণীর ঘাটে যত পালপাবনের যোগ আছে, উত্তরান, বারুনি, দশেরা, সাবেকি হিঁদুরা এখানে একবার আসে। আর মোচলমানের ত কথাই নেই। তা, ব্যাপারটা বুঝলেন ত বাবু?' তার হলুদ রঙ বড় দাঁতের হাসিটি গোঁফদাড়িতে ছড়িয়ে পড়লো, চোখের খয়েরি তারায় যেন রহস্যের ঝিলিক।

ঘটনা শুনলাম, তার মধ্যে আবার ব্যাপারটা কী? গূঢ় রহস্য কিছু আছে নাকি? আমি তার মুখের দিকে অবুঝ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

এমদাদ আমাকে অবাক করে দিয়ে, আদৌ গলা না চড়িয়ে গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠলো, 'কী বা হিঁদু কী মোচলমান মিলে জুলে করছে সাঁইজীর কাম।/ হিঁদুর গুরু মোচলমানের পীর সেই নাম রেখেছেন সাবের ফাকির।'…

আবেগে গেয়ে উঠেই, যেন বড় লজ্জা পেয়ে গেল। হাত জোড় করে বললো, 'কিছু মনে করলেন না ত বাবু?'

ভাবলাম, আমিও গেয়ে শোনাই, 'মন আছে তোর মনের ভেতরে। তারে একবার দ্যাখ না নেড়েচেড়ে।'…কিন্তু সুতোয় ভরা আবেগের লাটাইকে এত সহজে ছেড়ে দিতে পারলাম না। বাবুর মন যে! তবে এমদাদ আমার দিলে তুক করেছে। বললাম, 'মনে করব কী হে, তুমি যে আমার মন মজিয়ে দিলে।'

'ই আল্লা!' এমদাদ কপালে হাত ঠেকালো। 'গাইতে ত পারিনে বাবু, ত এসে গেল। আসলে কথাটা কী, এখানে জাত বেজাতের বিচার নেই। আচ্ছা বাবু বলেন তো, এই জাতের বিচার করলে কে?'

সর্বনাশ! হাতের মূলধন ইতিহাসের দুই চারি পাতা। জাতের বিচারকের সুলুক সন্ধান সেখানে নেই। নিজের দৌড় জানি। সিগারেটের টুকরো পায়ের স্যাণ্ডেলের তলায় চেপে দিয়ে বললাম, 'সে কথা তো বলতে পারবো না।'

'এই ত, এই একটুখানি ত জীবন, জাত জপে কী হয় বুঝিনে।' এমদাদের বড় দাঁতের হাসিটি কেমন ছায়াঘন হয়ে উঠলো, 'কবে আছি, কবে নেই, জানের বাসা ফুড়ুৎ।'

ছোট এ জীবনের ধরতাইটা এখান থেকেই শুরু। মনে করতে পারছিলাম না। আমি এমদাদের মুখের দিকে তাকালাম। তার কথা থেকেই অনুমান করি, চালচুলো নেই, এমন একজন ভূমিহীন, দরিদ্র বাঙালী ছাড়া সে আর কিছু

না। যেদিন যেমন জোটে, সেদিন তেমনি, দিনযাপনের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা যে নেই, সেটা তার সর্বাঙ্গে যেন লেখা রয়েছে। তার মধ্যেই কোথায় যেন জীবনের একটা পথকে সে, জেনে বা না জেনে, খুঁজে নিয়েছে। সেখানে তার সুখ স্বস্তি আছে কী না জানি না, হাসতে ভোলেনি। এমন কি নিখুঁজি মেয়ের 'পেটভাতায় সব হয় না, মন গতরের কথাও তার মনে থাকে।' হয়তো এটাই সহজ কথা। তবু দেখি, সংসারের সীমানায় দাঁড়িয়ে, সহজ কথা সহজ করে বলার শক্তি সকলের জন্য না। অনুভবের ঘরে তার আনা যানা চাই। এই এমদাদের সেই ঘরটা নিশ্চয় চেনা।

কথায় কথায় এমদাদের জিজ্ঞাসা। সে তত্ত্ব কথা বলেনি, নিজে সাঁইজী বনতে চায়নি। তবু মাঘের এই প্রাক-দ্বিপ্রহরে, জাফর খাঁ গাজীর নির্জন মসজিদ প্রাঙ্গণে, জীবনের একটা পাঠ নেওয়া হলো। পথ চলার এইটুকু লাভ। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'চললেন নাকি বাবু?' এমদাদও উঠে দাঁড়ালো।

বললাম, 'হ্যাঁ, এবার উঠি, বেলা তো বাড়ছে।' আমি পকেটে হাত দিলাম। কেন না, এমদাদের সেই কথাটা ভুলিনি, এই মসজিদ দেখাশোনা করার জন্য তাদের কয়েক ঘরকে সরকার নাকি কিছু দেয়। আর সমাধিতে যারা যা দেয়, তাই ভাগ বাটোয়ারা হয়।

'কোথায় যাবেন বাবু?' এমদাদ জিজ্ঞেস করলো।

আমি জাফর খাঁ গাজীর সমাধির দিকে পা বাড়িয়ে, উত্তরে হাত দেখিয়ে বললাম, 'এখন যাবো ঐ ঘাটে।'

'ছি বাবু, অমন করে ঘাটে যাব বলতে নেই।' এমদাদ এমনভাবে হাত তুলে বললো, পারলে আমার গায়ে হাত দেয়, 'বলেন, ঘাটের দিকে বেড়াতে যাবেন।'

তাও তো সত্যি কথা। এমদাদ জাত বেজাত না মানুক, হিন্দু মুখে ঘাটে যাবার কথা শুনলে, মনে তার অলুক্ষণে সংকেতটা কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঘাটে যাওয়া, শেষ যাওয়া। যে ঘাটে পা বাড়িয়েছে, সে আর পিছন ফেরে না। আমি সেই কথা ভেবে বলিনি। প্রয়াগে গুপ্ত বেণীর ঘাট দেখে এসেছি আগেই। মাথা মুড়িয়ে আসিনি বটে, কেন না, 'প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা / মরগে পাপী যথা তথা।' এক রকমের তীর্থ দর্শনেই গিয়েছিলাম বটে। কিন্তু সেই তীর্থের রূপ আলাদা। ঘুরে ঘুরে ভারত দেখবো, তেমন রেস্তো ছিল না। অথচ ভারতের মানুষের বিশ্বাস, কোটি গরু দানে যে-পুণ্যের ফল, তার থেকে মাঘ মাসে প্রয়াগে কল্পবাস করলে, সেই পুণ্য লাভ হয়। তার সঙ্গে যদি থাকে পূর্ণ বা অর্ধকুম্ভের যোগ, তা হলে তো কথাই নেই। সারা ভারতের মানুষ সেইখানে। তার জীবনের সকল বাসনা কামনা মানত মানসিক আর পাপ নিয়ে তারা আসে সঙ্গমের পুণ্য স্নানে। মুক্তি স্নানে।

আমি সেই ভারতকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেই আমার তীর্থ, সেই দর্শন আমার পুণ্য। কিন্তু ঘরের কাছে মুক্ত বেণী দেখা হয়নি। যারা পুণ্যস্নানের তীর্থে বিশ্বাসী, তারা গুপ্ত বেণীতে ডুব দিলে ভাবে, একবার মুক্ত বেণীতেও অবগাহন দরকার। বাসনা কামনা মানত মানসিক না থাক, মুক্ত বেণীর ঘাটে একবার বসে যাবো, এই ইচ্ছা। ভারতবাসীর কাছে যে-স্থানের জীবনকালের মহিমা, সে-স্থানকে ঘরের কাছে বলে তুচ্ছ করতে পারি না। এখন মেলা নেই, কোনো যোগ নেই, পার্বণ নেই। না-ই থাক, মুক্ত বেণীর ঘাট বলে কথা।

আমি হেসে বললাম, 'ঘাটে যাবার ডাক এলে, কে আর ধরে রাখবে? আমি সেই ভেবে বলিনি।'

'তা কি আর জানিনে বাবু?' এমদাদের বড় দাঁতে, গোঁফদাড়িতে হাসির ঝলক, 'আপনার এখন কাঁচা বয়স। ত, কথাটা শুনলে মনে ঝান খায়।'

জানি, ঘাটে যাবার কথা বলতে নেই। একলা আপন মনে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসা তো আরও অশুভ। তুমি মানো চাই না মানো, যারা মানে, তাদের মান রাখলে ক্ষতি কি? আমি পকেটে হাত দিয়ে, খুচরো পয়সা যা পেলাম, তা তুলে নিলাম। জাফর খাঁ আর দরাফ গাজী, যা-ই বলো, আগে তাঁর সমাধিতে কিছু রাখলাম। এই সময়েই, পঞ্চম ঋতুতে কুহু কুহু ডাক ভেসে এলো। স্বরটাও সপ্তমে না, একটু যেন অস্পষ্ট, পঞ্চমেই। আমি চোখ তুলে আশেপাশের গাছের দিকে তাকালাম। অকাল বসন্তের এই হঠাৎ ডাক, কিছু সংকেত দিচ্ছে নাকি? এতোক্ষণ ধরে তো, দোয়েল বুলবুলি টুনটুনির ডাকই শুনে আসছি।

'কী হলো বাবু?' এমদাদের হলদে চোখের খয়েরি তারায় অবাক জিজ্ঞাসা।

বললাম, 'কোকিল ডেকে উঠলো না?'

'হ্যাঁ বাবু। সব সোময়েই ত ডাকে।' এমদাদ যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেল, 'কোকিলের ডাকে কী হয় বাবু?'

হেসে বললাম, 'কিছু না। এতক্ষণ শুনিনি তো। মাঘ মাসেও এখানে কোকিল ডাকে?'

'মাঘ মাস কেন বাবু, সারা বছর ডাকে।' এমদাদের মুখের অস্বস্তি কাটলো। এখন তার চোখ গাজীর সমাধির ওপর।

তা বটে! এমন সবুজের ছায়া নিবিড় নির্জনে যদি বারো মাস না থাকবে ডাকবে, আর কোথায় বা যাবে ডাকবে। এখন তো দেখছি, রংবেরঙের প্রজাপতিও পাখা মেলে উড়ছে। আমি এগিয়ে গেলাম, হুগলির কোনো এক রাজার মেয়ের সমাধির দিকে। যাদের রাজ্য জয় করে, জাফর খাঁর ছেলে শাদী করেছিল। তার হিন্দু নাম কী ছিল, মুসলমানের বিবি হয়ে কী নাম হয়েছিল, কে জানে শ্বশুর আর পুত্রবধূ এক প্রাঙ্গণেই আছে। ছেলেটি

কোথায় গিয়ে মাটি নিয়েছে ? সব কথা জানা যায় না। ইতিহাসই কি জানে ? ভাবতে যদি চাও, ভেবে নাও, সে আরও অনেক রাজ্য জয় করেছিল, অনেক বিবির সঙ্গে ঘর করেছে, নানা খানে, নানা দেশে। তার সমাধির খবর কেউ জানে না।

আমি হুগলির রাজকন্যের সমাধিতে বাকি পয়সাগুলো রাখতেই, এমদাদ ধমকে উঠলো, 'আই, হেই রে, ওখেনে কী করছিস তোরা ? এই কচিকাঁচা-গুলোনকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, সেই গোটাকয়েক কুচোকাঁচা জাফর খাঁ গাজীর কবরের কাছ থেকে, চড়ুইয়ের মতোই ফুড়ুত ফাড়ুত মসজিদের মধ্যে দৌড়ে গিয়ে ঢুকছে। এমদাদ সেদিকেই তাকিয়ে। তার ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে, মুখে বিরক্তি। আবার বললো, 'আমি রয়েছি না ? যা, তোরা যা। যা জুটবে, আমি সব নিয়ে থুয়ে ভাগ বাটোয়া করে দেবখনি।'

মনে আমার সন্দ ধন্দ কিছু নেই। কুচোকাঁচাগুলো কেন সমাধির কাছে ছুটে এসেছিল, তা অনুমান করতে পারি। তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করছে এরা ?'

'কী আর করবে বাবু ?' এমদাদ আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। বিব্রত হাসি হেসে বললো, 'বলেন কেন বাবু, ইস্কুলে যাবে না, বাড়িতে থাকবে না, সারাদিন এখানে এসে ঘুরঘুর করবে। আর কেউ এসে দু চার পয়সা দিলে সেগুলোন তুলে নিয়ে বাজার দোকান থেকে এটা সেটা কিনে খাবে। দেখলেন না, যেই আপনার সঙ্গে ইদিকে ফিরেছি, অমনি মজ্জিদের ভেতর দিয়ে ছুটে এসেছে। এই নজর না রাখলেই পয়সাগুলোন নিয়ে পালাত।'

ছোট জীবন, তবু সব দিকে নজর রাখতে হয়। ওটাও জীবনের ধর্ম। কিন্তু এমদাদের ছেলে তুরাক আর দোসরদেরও এক পলকে দেখে নিয়েছি। আধ ন্যাংটো, গায়ের জামা ধুলিঝুলি, হাটখোলা বুক। ধাড়ির পিছু পিছু বাচ্চাগুলো চিরদিনই এমনি করে ফেরে। দোষ দেওয়া যায় কাকে ?

আমি বিবির গোরে পয়সা দিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে মনে ঠেক খেয়ে গেলাম। জানি, এমদাদের এখন এখান থেকে নড়াচড়া সম্ভব না। ধাড়ি গেলে, বাচ্চাগুলো পাকা ফলে হাত বাড়াবে। তারা যে মসজিদ বা আশে-পাশের ঝোপঝাড়ের আড়ালে রয়েছে আর এদিকেই নজর রেখেছে, কোনো সন্দেহ নেই। আমি পকেটে আর একবার হাত ঢুকিয়ে বললাম, 'এ পয়সা-গুলো তা হলে তুমি রাখো। আর ওদের একবার ডাকো না।'

এমদাদের চোখে অবাক জিজ্ঞাসা। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম, বললাম, 'ওদেরও তো কিছু পাওনা আছে। সেই ফিকিরে সারাদিন এখানে ঘোরাফেরা করে।'

'বাবুর যে কথা !' এমদাদের গোঁফদাড়ির ভাঁজে আর বড় দাঁতে হাসি

ছড়িয়ে পড়লো। তারপরেই গলা তুলে হাঁক, 'অই, অই রে, তুরাক, ফইজ, এজাদের নিয়ে ইদিকে আয়, বাবু তোদের ডাকছেন।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। মাঘের অল্প বাতাসে গাছের পাতায় ঝিরঝিরে শব্দ। সেই সঙ্গে পাখির ডাক। মাঝে মাঝে পঞ্চম স্বরে কোকিলের কুহু। আমি আর এমদাদ চারদিকে তাকাচ্ছি। আস্তে আস্তে ঝোপের আড়াল থেকে একটি একটি করে মুখ উঁকি দিতে শুরু করলো। এমদাদ একজনকে ডাকলো, 'আয় আয়, বাবু তোদের ডাকছে।'

দেখলাম, সকলের সন্দিগ্ধ ভয় ভয় চোখের দৃষ্টি আমার দিকেই। আমি সকলের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। হাসি দেখে ভয়টা বোধহয় একটু কাটলো। এমদাদ আবার ডাকলো, 'ইস, অন্য সোমায় বাবুদের পায়ে পায়ে ঘুরিস, এখন আর আসতে পারছিস নে ? ঝটপট আয়, বাবু কি তোদের জন্যে দিন কাবার খাড়া থাকবেন নাকি ?'

অন্য সময় বাবুদের পায়ে পায়ে মানে, ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয় না। পয়সা চেয়ে বেড়ায়। তবে, যেচে সেধে ডাকাটা একটু ভিন্ন রকমের ব্যাপার। এমনটা বোধহয় ঘটে না। এমদাদের শেষ কথায়, সব কটা এবার ভয়-পাওয়া মুরগীর মতো, আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে এলো। দেখলাম, গুণতিতে কুল্যে চারজন। তার মধ্যে একটার গায়ে যদি বা ছেঁড়া ধুলিঝুলি জামা আছে, তলার দিকটা একেবারে খোলা। আমি সামান্যতম মূল্যের একটি করে মুদ্রা ওদের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সবাই হাত পেতে নিল। এমদাদ বললো, 'হয়েছে তো ? যা, এবার সব ঘরে যাদিনি, পালা। নইলে পিটিয়ে হাড় ভাঙব।'

যেমনি বলা, তেমনি সবাই চড়ুইয়ের মতোই ঝোপে ঝাড়ে মিশে গেল। এমদাদ বিবির গোর থেকে পয়সাগুলো তুলে নিল। আমি পকেট থেকে হাত তুলিনি। কারণ তোমার পিছু টানটা রয়েছে মনের আর এক কোণে। তবু পা বাড়ালাম। এমদাদ আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে গাজীর গোরের ওপর থেকেও পয়সাগুলো নিল। চাদরের ভিতর হাত ঢুকিয়ে কোথায় যেন রাখলো। বোধহয় জামা আছে এবং তার পকেটও আছে। অন্যথায় লুঙ্গির কষিতে গুঁজতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি একটি কাগজের টাকা বের করে এমদাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এটা তুমি রাখো।'

এমদাদ এমনটা আশা করেনি। এক পলকের জন্য তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো ধন্দ লাগা বিস্ময়। তারপরেই তার সারা চোখে মুখে গোঁফ-দাড়িতে ঝলক দিল হাসি। তবু যেন লজ্জা কাটতে চায় না। বললো, 'কেন বাবু, আবার এটা কেন ? যা দেবার দিয়েছেন তো।'

বলতে পারতাম, একে বলে, পেটে খিদে, মুখে লাজ। কিন্তু এ মানুষটাকে নিয়ে তেমন ভাবতে ইচ্ছা করে না। বরং সহবতের কথাই মনে আসছে।

সেই কারণে লজ্জাটা আমার মনেও। বললাম, 'পকেট ভরতি নেই, তবু তোমাকে দিতে ইচ্ছে করছে। কিছু মনে করছো না তো?'

'ই আল্লা!' এমদাদের হাসি মুখের একূলে ওকূলে ঢেউ দিল, 'আপনি দিলে আমি কিছু মনে করব? এ তো আমার তকদির বাবু। আজ না জানি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। দ্যান বাবু।' সে দু হাত পেতে বাড়িয়ে দিল।

মিথ্যা বলিনি। কানা না হোক, কড়ি আমার গোনাগুনতি। দানসাগরের দরাজ হাত হবার উপায় আমার নেই। তবু, সেই একই কথা, মন গুণে ধন। তার অন্ধিসন্ধি সব সময়ে নিজে বুঝতে পারি, এমন না। এমদাদ আমার সেই না-জানা মনের কোথায় ঢেউ তুলেছে। গরীবকে রাজা করেছে। আমি তার হাতে টাকাটা দিয়ে বললাম, 'কার মুখ দেখে আর উঠবে? নিশ্চয়ই বিবির মুখ দেখেই উঠেছো?'

'বাবু যে কী বলেন!' এমদাদ তার ভাঙ্গা সরু গলায় উচ্চস্বরে হাসলো, 'তা বাবু, ঘর করতে পাশাপাশি, বিবি না হোক, ছেলে মেয়ের কারুর মুখ দেখেছি।'

আমি যে-পথে এসেছিলাম সেইদিকে পা বাড়ালাম। এমদাদকে সঙ্গে আসতে দেখে বললাম, 'বাড়ি কি তোমার এদিকে?'

'না বাবু, আমি যাব পশ্চিম।' এমদাদ বললো, 'চলেন, আপনার সঙ্গে সাঁকো তক যাই। আপনি ঘাট বেড়াতে যাবেন, আমার ত যাবার উপায় নেই। নইলে সঙ্গে যেতাম।'

আমি ঢালু পথে পা বাড়ালাম। ত্রিবেণীর ঘাটে এমদাদের যাবার উপায় নেই, কেন, তা জানি। জানি না, কেবল জাতের বিচার করলে কে? অথচ যে-গাজীর মসজিদ আর সমাধি ছেড়ে যাচ্ছি, তিনি নাকি গঙ্গামন্ত্র জানতেন, গঙ্গাপুজা করতেন। বৈপরীত্য একে বলে।

সূর্য পশ্চিমে ঢল খেলেই যে শীতের বেলার তাড়া লেগে যায়, এমন না। পাঞ্জাবির হাতা সরিয়ে কবজি ঘোরাতেই দেখি, সময়ের কাঁটা বেলা বারোটা ছুঁই ছুঁই। একটু আগে প্রাক-দ্বিপ্রহর মনে হয়েছিল। কিন্তু মন পিছিয়েছিল ঘণ্টাখানেক। এ দেখছি, গাজীর বাঘের দৌড় আর বাবাজীর দাওয়ায় চাপড়ের দৌড়ের মতো, সময় কেটে গিয়েছে পলকে।

ঢালু পথে নামতে নামতেই একটা যেন হাসিখুশির হৈচৈ কানে ভেসে আসছিল। নিরালা রাস্তাটায় আবার কাদের দল এলো। গাছের আড়াল ছেড়ে আসতেই চোখে পড়লো, উত্তরের পথে চলেছে শবযাত্রা। কিন্তু ঠিক না, একেবারে ঠোক্কর। জীবনে এমন দৃশ্য কদাপি নয়নগোচর হয়নি। শব-কাঁধে শ্মশানযাত্রী চারজনই মহিলা। চালিতে সারা গা কাপড়ে ঢাকা, শবের রোদ লাগা মুখখানিও দেখছি মহিলার।

ব্যাপার দেখে দাঁড়িয়েই পড়েছিলাম। এমদাদ আলি খাঁ বলে উঠলো, 'তোবা তোবা। মেয়েমানুষ মড়া বই করছে, এমন তাজ্জব কাণ্ড আর দেখিনি।'

আমারই মনের কথা। আমি তার দিকে ফিরে তাকালাম না। ঠোক্কর খেয়ে রাস্তার ওপর অবাক ঘটনাটাই দেখছিলাম। মহিলা বললে ভদ্রলোকেরা যেমনটি ভাবেন, শববাহিকাদের দেখে ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে না। কোন্ শ্মশানযাত্রীরাই বা পোশাকের চাকচিক্যের ধার ধারে। বরং হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তা-ই গায়ে চাপিয়ে কোমরে একটা গামছা বেঁধে নিলেই হলো। তবু বসন ভূষণ চেহারায় একটা স্তরভেদের ছাপ থাকে। এই শব-বাহিকাদের সব কিছুতেই কেমন একটা গ্রাম্যতার ছাপ। অবিশ্যি বিচার করা দায়। কারণ, জীবনে এমন দৃশ্য দেখিনি। শব বয়ে নিয়ে চলেছে রমণীর দল। শাড়ি জামায় সাধারণ সধবার বেশে, তাদের সামাজিক স্তরভেদ এই চর্ম চক্ষে সম্ভব না।

শবাধারের চার বাহিকাই প্রায় প্রৌঢ়া। শাড়ি জামার ওপরে কারোর গায়ে বা কোমর জড়িয়ে গামছা। হরিধ্বনির হাঁক নেই, ঠোঁট নড়ছে দেখতে পাচ্ছি। গলার স্বর যে তাদের নিভু নিভু, তা বোঝা যাচ্ছে তাদের চলন দেখে। কারোর পা পড়ছে এলোমেলো। কাঁধ নুয়ে পড়েছে। কোমর সোজা করে চলবার ক্ষমতা নেই। কোনোরকমে বহে নিয়ে চলেছে, জোর কদমের কোনো কথাই নেই। যদি ঠিক দেখে থাকি, কারোর জিভ বেরিয়ে না পড়লেও, এই মাঘের রোদেও মুখে তাদের ঘাম ঝরছে।

অবলা বলে হেলা করতে চাই না। চিত্রটি যদি বা অভূতপূর্ব, চার বাহিকাদের দেখে কষ্ট লাগছে। খবরের তল পাওয়া যাবে কী না, জানি না। ঘটনার এমন কি গতি, পুরুষ বাহক জোটেনি? পিছনে একদল কুচোকাঁচা যারা জুটেছে আর হাততালি দিয়ে হাসছে, ওরা যেন শ্মশানযাত্রী না, তা বোঝা যাচ্ছে। পথ চলতে মজা লোটা। এমন মজাই বা আর কে কবে দেখেছে? তা ছাড়া, বেলা এগারোটায় মিল ছুটি হয়েছে। ইতিমধ্যে মজুরদের ভিড় কমে গিয়েছে বটে, তবু কিছু লোক আশেপাশে ছড়িয়ে যেন শবানুগমনেই চলেছে। কেউ অবাক, কেউ হাসছে, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

এমদাদের 'নিখুঁজি মেয়ে ক্যামপের' টিনের দেওয়ালের ফাঁক ফোকরে নানা বয়সের স্ত্রীলোকদের বিস্তর মুখ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এমন একটি দৃশ্য উপভোগের জন্যে, তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি ধাক্কাধাক্কি লেগে গিয়েছে। হনুমানের মতো একদল ছেলেপিলে উঠে পড়েছে গুদাম ঘরের ঢেউ খেলানো টিনের চালায়। এমদাদের গলায়, আক্কেল গুড়ুম! 'তোবা তোবা।' আর থামে না।

আক্কেল গুড়ুম আমারও বটে। তবে, শববাহিকাদের পাশে পাশে চলা

একটি লোককে দেখে বুঝতে পারছি না, সে কে। সঙ্গেই বা কেন? লম্বাচওড়া ফরসা লোকটি প্রৌঢ় হলেও তাকে সুপুরুষ বলতে হবে। একদা যে রূপবান ছিল, সন্দেহ নেই। খালি পা। ধুতির ওপরে বুক খোলা একটা পাঞ্জাবি। কোমরে জড়ানো খয়েরি রঙের পশমী চাদর। মাথার চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু কালোই যেন বেশি। একমাত্র সে-ই মাঝে মাঝে চিৎকার করে 'বল হরি, হরি বোল' দিচ্ছে। আর তার প্রতিধ্বনি করছে পিছনের মজাখোর, কতগুলো রাস্তার ছোট ছোট ছেলে। অথচ এমন না, যে খই বা পয়সা ছড়িয়ে শবযাত্রা চলেছে। ধুলিঝুলি পোশাকে আধল্যাংটোর দলের পিছন নেবার একটা অন্য উদ্দেশ্য থাকতো। আসলে, ওদের মজার পালে হাওয়া লেগেছে।

আমার মজার পালে হাওয়া লাগবার কিছু নেই। অবাক কৌতূহলের পালটা থর থর করছে। কথায় বলে, বাপের জন্মে দেখিনি। সত্যি কথা, আমার বাবা ঠাকুর্দার মুখেও এমন ঘটনার কথা শুনিনি। মনে একবার প্রশ্ন জাগলো, একি বিশেষ কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রথা বিশেষ? নিজের দেশেরই বা কতটুকু জানি।

আমি রাস্তায় নেমে গেলাম। পিছনে পিছনে এমদাদ, 'চললেন বাবু?'

'হ্যাঁ, এবার যাই। মনে হচ্ছে, এরাও ঘাটে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী, সেখানে গেলে জানা যাবে।'

এমদাদ রাস্তার ধার দিয়ে আমার সঙ্গেই পা বাড়ালো। বললো, 'হ্যাঁ হিঁদু যখন ঘাটেই যাবে। তবু একবার খোঁজখবর করে দেখি, এ আজব কান্ডটা কী? বলতে বলতে সে পিছন দিকে চলে গেল। যাবার আগে আমাকে বলে গেল, 'আপনি চলেন বাবু, আমি আসছি।'

অন্তর্যামী অন্তরে থাকেন বলেই জানি। সেটা মানুষের নিজের সত্তা। বাইরে তার কোনো অস্তিত্বের সন্ধান জানি না। সে যখন হাসে, মানুষের অন্তরে বসেই হাসে। মানুষ হয় তো সেই হাসিটা দেখতে পায় না। কয়েক পা চলতে চলতে শববাহিকাদের থেকে কিছুটা দূরত্বে আমার অন্তর্যামীও হাসছিল কী না, বুঝতে পারিনি। হঠাৎ মনে হলো, চালির সামনের দিকে বাঁয়ের শববাহিকা একবার আমার দিকে তাকালো। ঘাড় ঝাঁকিয়ে কী একটা ইশারা করলো।

আমি আমার বাঁয়ে তাকালাম। আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। ধন্দ ভেবে, আবার তাকালাম। দেখি, শববাহিকারা দাঁড়িয়ে পড়েছে। শবাধারের সামনের দিকের বাহিকা বাঁ হাত তুলে আমাকেই ইশারায় ডাকছে। আমি ছাড়া তার বাঁয়ে আর কেউ নেই। ঘোলা চোখের করুণ দৃষ্টিও আমার দিকে। না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'আমাকে কিছু বলছেন?'

বাহিকার খোলা চুলে অল্প স্বল্প পাক ধরেছে। মুখে ঘাম। মাথা ঝাঁকিয়ে জানালো, আমাকেই ডাকছে। অবলা বলে হেলা করি না। নারীর আর

এক নাম তো শক্তি। মানবতা বলেও একটা কথা আছে তো। তবু যে কেন চিরকালের মনটা ভিতরে ভিতরে গুটিয়ে যেতে লাগলো, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু কাছে এগিয়ে গেলাম। আর কর্ণে আমার বজ্রাঘাত! বাহিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'আর পারচিনে বাবা, একটু কাঁধ দাও।'

কাঁধ দেবো? বলে কী? সত্যি বলছে নাকি? নাকি, বলা সম্ভব? আমি ভাবছিলাম, না জানি কী এক আজব ব্যাপার। অথবা বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য। শেষটায় বলে কী না, 'কাঁধ দাও!' জলে পড়লাম, না না আগুনের হাতায়, সাত পাঁচ ভেবে পাচ্ছি না। আমার মুখের চেহারা তখন কেমন, নিজে দেখতে পাচ্ছি না। কেবল অবাক অবিশ্বাসের স্বরে বললাম, 'কাঁধ দেবো?'

'হ্যাঁ বাবা।' বাহিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, ঘোলা চোখের তারা দুটো মরা মাছের মতো। হাত দিয়ে নিজের পায়ের দিকে দেখিয়ে বললো, 'দেখ বাবা, পা দুটো ফুলে ঢোল হয়ে গেচে, এক ফোঁটা তাগদ নেই। এবার মুখ থুবড়ে পড়ব। এসে গেচি বাবা, এইটুকু পথ, একটু কাঁধ দাও।'

তাকিয়ে দেখি, সত্যি কথা। পা দুটো ফুলে ঢোল, পাঁউরুটি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাসী আলতার দাগ রয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের ঘিরে অনেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এমদাদ আমাকে ডাকছে, 'বাবু, ইদিকে আসেন, ইদিকে।'

হঠাৎ সেই লম্বা চওড়া ফরসা লোকটি এগিয়ে এলো। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তার বোতাম খোলা জামার বুকে দেখি, মোটা একগাছা পৈতা। বললো, 'বলেছে যখন নাও বাবা। মেয়েমানুষ, কত আর পারে। এখান থেকে তো নয়, অনেক দূর থেকে আসছে।'

তা আসতে পারে, কিন্তু অনেক দূরের পথে শেষটায় চোখে পড়লাম আমি? গেরো আর গ্রহ বলো, একেই বলে। আমি মুখ ঘুরিয়ে অন্যান্য বাহিকাদের দিকে তাকালাম। পিছন থেকে, ডাইনের কোমল মুখ, ডাগর চোখ, প্রৌঢ়াটি ব্যগ্র ব্যাকুল স্বরে বললো, 'নাও বাবা, একটু কাঁধ দাও, ও আর পারচে না। দেখে মনে হচ্ছে, তোমার প্রাণে দয়া আছে।'

দয়া এখন আমার গয়ায়, মস্তিষ্কে পিন্ডি দিচ্ছে। পিছন ফিরে দৌড় দেবো কী না ভাবছি। দিলেই বা কে কী বলবে। কাঁধ না দিতে চাইলেই বা কার কী বলার আছে। এমদাদের ডাক তো তখনও শুনতে পাচ্ছি। তার দিকে মুখ ফেরাতে যাবো। লম্বা চওড়া গোরা পৈতাধারী বলে উঠলো, 'সত্যি বাবা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তোমার দয়ার শরীর।'

সামনের ডান দিকের বাহিকা যেন মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠলো, 'তুমি চুপ যাও তো ঠাকুর, আর মুখ সাপুটি কোরো না।'

ঠাকুরমহাশয়ের হাসিটি আদৌ ছানা কাটলো না। আমি বললাম, 'আপনি কাঁধ দিচ্ছেন না কেন?'

ঠাকুরমহাশয় একেবারে মাকালী। মস্ত জিভ বের করে চোখ ঘোরালো। বুকের কাছ থেকে পৈতেগাছা টেনে বের করে দেখিয়ে বললো, 'পুরোত মানুষ বাবা, আমি তো শ্মশানক্রিয়া করতে যাচ্ছি। মড়া বইতে পারি না।'

এদিকে আমার ডান পাশের বাহিকার কষ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। হাঁপের থেকেও কষ্ট বেশি, কোনোরকমে বললো, 'কাঁধ দাও বাবা, এবার পড়ে যাব।'

তার ওপরে দেখছি, শরীর কাঁপছে থরথরিয়ে। একি ঘোড়া দেখে খোঁড়া? এতক্ষণ দিব্যি চলছিল। কিন্তু নিজের সঙ্গে লড়াই করে হার হলো। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে বললাম, 'কিন্তু আমার পায়ে যে চামড়ার স্যাণ্ডেল রয়েছে।'

'ও সব আমি শোধন করে দেব।' ঠাকুরমহাশয়টি হেসে বললো, 'মন্ত্রে কী না হয় সব আমার জানা আছে। তুমি স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়েই চল বাবা।'

অবস্থা এমন, এখন এখানে দাঁড়িয়ে ঘটনার সাত সতেরো খবর নিই, তার উপায় নেই। চালির সামনের ডান পাশের বাহিকা যেভাবে ঠাকুরকে মুখ ঝামটা দিল সেটাও যেন কেমন চালে মিলছে না। নিজের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। পাশের বাহিকার অবস্থা সঙ্গীন। কাঁধের ঝোলা সাব্যস্ত করে, কোচা গুঁজলাম মাল সাপটে। কাঁধ বাড়িয়ে দিলাম চালিতে। ঠাকুর চিৎকার করে হরিধ্বনি দিল, 'বল হরি, হরি বোল।...'

বাহিকারা ক্লান্ত নিচু স্বরে হরিধ্বনি দিল। পিছনে ধুলিঝাড়ার দল জোরে হাঁকলো। নিষ্কৃতি পাওয়া বাহিকাটি সেইখানেই বসে পড়লো। পিছন থেকে এক বাহিকা বলে উঠলো, 'বসো না গো দুগ্গো-দিদি, তা হলে আর উঠতে পারবে না। আস্তে আস্তে চলতে থাক।'

ঠাকরুন দুগ্গো-দুর্গা, যা-ই হোক, তার উঠে দাঁড়াবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ঝুঁকে পড়ে দু হাত মাটিতে রেখে কোনোরকমে বললো, 'তোরা এগো লক্ষ্মী, আমি আসচি।'

ঠাকুরমহাশয় তাড়া দিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দাঁড়ানো নয়, চল চল। বল হরি, হরি বোল।'

আবার বাহিকাদের ঠোঁট নড়লো। ধুলিঝাড়াগুলো হেঁকে নেচে আওয়াজ দিল। তার মধ্যেই 'নিখুঁজি' আস্তানা থেকে রমণীর উচ্চস্বর শোনা গেল, 'ভাল পথ দেখাইলা গো মায়েরা, অখন থেইক্যা আমাগো মড়া আমরাই কান্ধে লইয়া যামু। পুরুষে আর কাম নাই।' বলার শেষেই খিলখিল খলখল হাসি!

এদেশে শ্মশানযাত্রা মানে, হাঁকেডাকে গগন ফাটে। তবু শ্মশানযাত্রা বলে কথা। পরলোকের ভয়ভক্তিতে দর্শকেরা মৃতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে কপালে হাত ঠেকায়। বোধহয় নিজের জীবনের অমোঘ দিনটির কথা মনে

পড়ে যায়। আর এ শ্মশানযাত্রায় ফুর্তির ফরুরা, হাসির গরুরো। কর্ম আর ভাগ্য, যা-ই বলো, এখন পা বাড়াও হে শ্মশানযাত্রী।

ডান পাশের বাহিকার সঙ্গে আমার শরীরের দৈর্ঘ্যে অমিল। অতএব, আমার দিকে চালি উঁচু, তার দিকে নিচু। চালি কাত হয়ে পড়লো। তা পড়ুক, সে-সব এখন দেখবার সময় নেই। তবে নিজের মতো পা চালাবার উপায় নেই। বাহিকাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে সেই টুকুস টুকুস চলা। অবলা বলে হেলা করি না। কিন্তু পদক্ষেপের বিশ বাইশ আছে। দূরের পথের ক্লান্তি আছে। এক সঙ্গে চলতে গেলে, তাল মিলিয়ে চলতে হয়।

সামনে তাকিয়ে দেখি, এমদাদ রাস্তার বাঁ ঘেঁষে আগে আগে চলেছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে ঠাস ঠাস করে কপাল চাপড়ালো। মাথা নাড়লো হতাশায়। আর গোঁফদাড়ির ভাঁজে তার হাসির হা নেই। কেবল ঠোঁট নেড়ে যেন কিছু বলছে। মুখ শুকিয়ে আমসি। সে যে কপাল চাপড়ে হায় হায় করছে, কোনো সন্দেহ নেই।

আর হায় হায়। কাঁধ যখন একবার দিয়ে ফেলেছি, আর তা সরাবার উপায় নেই। স্ত্রীলোকদের শব বহন সম্পর্কে সে নিশ্চয়ই কিছু খবর পেয়েছে। যে-খবরটা জানবার জন্য, ব্যগ্র কৌতূহল আমার ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকেছে। অথচ জানতে পারছি না কিছুই। অতএব আপাতত এমদাদের কপাল চাপড়ানো, মাথা ঝাঁকানো বে-ফয়দা। একে যদি আর্তের সেবা বলে, আমি তার ধারেকাছে নেই। সেবা করতে শিখিনি, তার আবার আর্ত। বড় কথায় বড় ভয়। সহজ কথা, আমি ডাকের পাখি। অলক্ষ্যে কে ডাক দেয়, আজও তার দেখা পাইনি। ডাক শুনলে, ডানায় আমার অস্থির কাঁপন। উড়তে না পারি, দৌড় দিতে পারি। সম্মোহন আর আত্মসম্মান, যা-ই বলো। তখন আমি ঘর করেছি বাহির। তবু কবুল করেছি আগেই, বিবাগী নই, বৈরাগ্য নেই। কপাল ঠোকার তীর্থে আমার যাত্রা না। পথ চলাটা আমার, পাখা ঝাপটার খুশির ডিগবাজি। আর্তের সেবায় আমি ঠেকতে রাজী না।

কেবল কথায় দূরের কথা, ভাবনাতেও চিঁড়ে ভেজে না। সেবা তোমার ঘাড়ে চেপেছে। সেবা? জোয়াল বলতে পারতাম। তবে ঐখানে মনে কিঞ্চিৎ খচখচানি। চালিতে যে চিৎশয়ানে শেষ যাত্রা করেছে, তাকে নিতান্ত জোয়াল বলতে বাধো বাধো লাগছে। পরিচয় না জানা থাক, তবু সে মানুষ। কামাখ্যা পাহাড়ের পবিত্রী মায়ের কথা মনে পড়লো। কেবল মানুষ না, নারী। মূলে, পরিচয় তার শক্তিস্বরূপিণী। তত্ত্বে যদি না-ই বা চলি, জন্মটাকে অস্বীকার করি কোন্ যুক্তিতে। গর্ভধারিণী বলেও একটা পরিচয় আছে। তা সে যারই হোক। অতএব জোয়াল বলতে পারি না। স্কন্ধে আমার নারী।

ঠাকুরমহাশয়টি হঠাৎ গলা খুলে গান ধরে দিল :

'এ বড় সাধের আসা যাওয়া।
কে আনলে সেধে
কে বা ছাড়লে খেদে
নাকি যাও, আপনি সেধে
কেউ করে না তার বলা কওয়া
এ বড় সাধের আসা যাওয়া।'···

'মরণ।' আমার ডান পাশের বাহিকা প্রায় দম আটকানো গলায় বললো, 'প্রাণে বড় ফুর্তি লেগেছে, গান ধরেছে।'

ঠাকুরমহাশয় চলছিল চালির ডানদিক ঘেঁষে। কথাটা তার কানে গেল। সেই আবার মাকালী। একবার জিভ বের করে ভুরু কপালে তুলে বললো, 'ছি ছি ছি, সন্ধেতারা, এর মধ্যে তুমি ফুর্তি দেখলে কোথায়? এ হল গে, তোমার বাঁচা মরার তত্ত্বের গান।'

বলতে বলতে চালির সামনে দিয়ে ঘুরে আমার পাশে এসে আবার স্বর চড়িয়ে গেয়ে উঠলো,

'তুমি সাধলে আসবে
বাদ সাধলে যাবে
এমনটি না ঘটে ভবে
সাঙ্গ হলে লীলা খেলা সবই হাওয়া
এ বড় সাধের আসা যাওয়া।'···

খ্যামটা না ঢপ অঙ্গের সুর, শ্রবণে এখন সেই বিচারের গুণ নেই। তবে মহাশয়ের লম্বা চওড়া শরীরটির মতোই, গলাখানিও বড় আওয়াজের। সুরে আর তালেও নেহাত মাটো খাটো না। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী বাবা, মিথ্যে বলেছি?'

আমার জবাবের আগেই পিছন থেকে কোনো বাহিকার স্বর শোনা গেল, 'মিনসের শরীরে দুঃখ কষ্ট বলে যদি কিছু থাকে।'

উঁমম! উঁহু, কানে যেন কথাগুলো কেমন খটখট করে বাজছে। 'মরণ' 'মিনসে' উচ্চারণের ধিক্কারে, গ্রাম্য ধ্বনি। কিন্তু, এদের স্বরে কি কেবলই গ্রাম্যতা? 'মুখে আগুন' শুনিনি এখনও। তবু ঠাকুরমহাশয়ের 'সন্ধেতারা' সম্বোধনটি কানে লেগে আছে। সন্ধ্যা শুনেছি, তারা নামও শুনেছি। দুয়ে মিলে 'সন্ধেতারা' আর কখনো শুনেছি, মনে করতে পারি না। সম্বোধনের মধ্যেও কেমন সখা ভাবের স্নেহের সুর। সম্পর্ক নিরূপণ সহজ না।

এ ছাড়াও আর একটা কেমন ধন্দ লেগে গেল। আমার নাসারন্ধ্র স্ফীত হলো। ঠাকুরমহাশয়টির সুপুরুষ চেহারার বড় চোখ দুটি প্রথম থেকেই একটু লাল দেখেছিলাম। চোখের রঙ সকলের একরকম না। কিন্তু এখন কাছে এসে, গলা খুলতেই, বাতাসে যেন কিসের গন্ধ? যেন কোনো চেনা দ্রব্যের।

কোথায় যেন গান শুনেছিলাম 'রঙ খেলে, রঙ লাগে প্রাণে আমার রঙ লেগেছে নয়নে।' ঠাকুরমহাশয়টির যেন সেই অবস্থা। আমি একবার তার দিকে তাকালাম।

ঠাকুরমহাশয় চলতে চলতে পিছন ফিরে উদাস হেসে বললো, 'চারুবালা, ওইখেনটিতে তোমরা উলটো বোঝ। ভাবো বুক কপাল চাপড়ে কান্নাকাটি করলেই শোক দুঃখ করা হয়। হ্যাঁ, মনের কষ্টে বুক কপাল চাপড়ে কাঁদবে বই কি। কিন্তু মনে মনে যে কাঁদে, শোকে বুক ফেটে যায়, লোকে সেটা দেখতে পায় না। তা বলে কি তার শোকটা শোক নয়?' আমার দিকে ফিরে ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল, 'কী বল বাবা, ঠিক বলছিনে?'

হুঁ, আর কোনো সন্দ ধন্দ নেই, মহাশয়ের নিশ্বাসে গন্ধমাদন। সন্ধে-তারার বুকে দম নেই, তবু গলায় বিদ্রূপের ঝাঁজ, 'মরে যাই আর কি! শোকে পাথর ফাটচে।'

আমার জবাব দেবার অবকাশ নেই। আমি এখন শববাহী, নিমিত্তমাত্র। যাদের কথা, তারাই বলছে, কইছে। কিন্তু বাহিকাদের বলা কওয়ার মধ্যে ঝাঁজ বিদ্রূপ যাই থাক, কেমন একটা অভিমানের সুরও যেন আছে। কথা তাদের ভাববাচ্যে। কথন ভঙ্গিটা যেন, অই কী বলে হে। আঁতের ঘরে মাখামাখি, বাইরে, দাঁতে কাটাকাটি। সম্পর্কটা কেমন থাকলে, এমন ভাবে ভঙ্গিতে কথা চালাচালি হয়?

সে জিজ্ঞাসাটা ঠেকে আছে আমার ব্রহ্মতালুতে। নারীলোকে শব বহন করে। সঙ্গে চলে ঠাকুরমহাশয়। এমন আজব কাণ্ডের কারখানায় আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কারখানার কারবার বুঝি না। এরা কারা, কোথা থেকে এলো, ঠাকুরমহাশয়ের সঙ্গে কি সম্পর্ক, এ রহস্যের সন্ধান পাওয়া অতি দুষ্কর। এসব কথাবার্তা সম্বোধন দিয়ে, অবস্থার বিচারও চলে না। অবস্থা বলতে বুঝি, সমাজ ও আর্থিক। ইংরেজীতে সেই কী একটা কথা যেন আছে? আনসোফিস্টিকেটেড। ওটা সব সময়ে আর্থিক অবস্থা দিয়ে বিচার করা যায় না। গ্রামে তো বটেই, অনেক সময় নগর জীবনের উচ্চবিত্তের অন্দরমহলে এমন বচন বাচন চলে। স্তরভেদটা জীবনযাপন আর শিক্ষায়। শববাহিকাদের মফস্বলীয় গ্রাম্য বচন, বসন ভূষণ দেখে আগেই বুঝেছি, নম্র চিকন লালিত্য নেই। সমাজের ক্ষেত্রটা নির্ণয় করতে পারিনি।

কিন্তু সব মিলিয়ে কোথায় একটা ঠেক লেগে যাচ্ছে। তার ওপরে ঠাকুরমহাশয়ের চোখের রঙ, আর মুখের রংয়ের গন্ধে, আমার বিলকুল গোলমাল লেগে যাচ্ছে। বয়সের ছাপ দেখে, একটা ধরতাই পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে সবাই প্রায় প্রৌঢ়া এবং প্রৌঢ়, যাকে বলে দিনকাল যাবার সময় হয়েছে। তবে মিছে ভাবনায় আত্মবিভ্রম বাড়ে। কাঁধ যখন দিয়েছি, ওখানেই সব ভাবনার ইতি। এখন কাঁধের বস্তু যথাস্থানে নামিয়ে দিলেই খালাস।

তারপরে আজব কাণ্ডের উৎস জানা গেল, ভালো। না জানলেই বা মাথা কুটবো কোথায়।

থমকে দাঁড়াতে হলো। কাঁচা রাস্তা ভাঙা। এক হাঁটু নিচে নেমেছে। এবড়ো খেবড়ো নিচু রাস্তা খানিকটা গিয়ে। আবার আস্তে আস্তে সাঁকোর দিকে ওপরে উঠেছে। সন্ধেতারার গলায় শোনা গেল, দম চাপা অস্ফুট শব্দ। কষ্টের শব্দ। ঠাকুরমহাশয় হাঁকলো, 'সাবধান, আস্তে।'

আমিই আগে নিচে পা দিলাম। সন্ধেতারার পক্ষে অবস্থাটা কঠিন হলেও, বুদ্ধি করে, চালির বাঁশ দু-হাতে একটু উঁচু করে ধরলো। চেষ্টা করলো, আমার কাঁধ সমান রাখতে। ঠাকুরমহাশয় এখন পিছনে, 'হ্যাঁ, অ্যাই, অ্যাই, লক্ষ্মীমণি আর চারুবালা, এবার তোমরা এগোও।'

এর আগে লক্ষ্মী নামই শুনেছিলাম। ঠাকুরমহাশয়ের মুখে লক্ষ্মী এখন লক্ষ্মীমণি। পিছন থেকে লক্ষ্মী বা চারুর প্রায় গোঙানো স্বর শোনা গেল, 'তুমি চুপ কর, আমাদের কাজ আমরা করচি।'

যখন বুঝলাম, সকলেই নিচে নেমে এসেছে, আবার আস্তে আস্তে চলা শুরু হলো। রাস্তা একটু একটু করে ওপরে উঠেছে। মাঠের গরুর পাল ছেড়ে রাখালটা এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। সেই সঙ্গে গোবর কুড়ানী বউ আর ছোট মেয়েটিও। তাদের পাশে এমদাদ। সে সঙ্গ ছাড়েনি। রাখালের সঙ্গে কী সব কথা হচ্ছে। কিন্তু চোখ আমার দিকে। মাথা ঝাঁকানো আর বুক চাপড়ানো নিষ্ফল জেনেই, ক্ষান্ত দিয়েছে। গোঁফদাড়ির ভাঁজে বিমর্ষ মুখ। হলদে চোখের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি আমার দিকেই। এখনও কিছু ইশারায় বলবার চেষ্টা করলো। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। উপায় ছিল না। কাঁচা রাস্তা ভাঙাচোরা। কোথায় পা ফেলতে, কোথায় ফেলবো। তখন ঘাড়ের চালি টালমাটাল হয়ে, সব পয়মাল হবে। সাবধানে চলতে হচ্ছে।

ঠাকুরমহাশয় সামনে আওয়াজ দিয়ে চলেছে, 'খুব সাবধান, রাস্তা খারাপ। ওপরে উঠচ, হ্যাঁ, চারুবালা আর লক্ষ্মীমণি তোমরা খুব সাবধান। এখন পেছনে বেশি ভার পড়বে। তেমন বুঝলে, একটু দাঁড়িয়ে যাও। দুগ্গোদেবী এসে গেচে। সে সামনে গিয়ে বাবাকে ছেড়ে দিক, বাবা পেছনে এসে সামাল দেবে।'

কথাটা অবিশ্যি মিথ্যা না। উঁচুতে উঠছি। এখন যারা পিছনে, তাদের কাঁধে ভার বেশি। পিছন থেকে কোনো বাহিকার সেই একই রকম মুখ ঝামটা শোনা গেল, 'আমরা কী করব, কারুক্কে দেখতে হবে না। খালি মুখে পটপটানি।'

ঠাকুরমহাশয় যেমন তেমনি। হংসের গায়ে জল ধরে না। মুখে হাসিটি লেগে আছে। কোনো বিকার বিকৃতি নেই। বললো, 'হ্যাঁ, বাহ, দুগ্গোদেবী পেছনে কাঁধ দিয়েছে, আর ভাবনা নেই। শরীরটা এখন একটু যুত লাগচে তো দুগ্গোদেবী?'

কারোর কোনো জবাব শোনা গেল না। আমি পিছন ফিরে দেখতে পাচ্ছি না। ঠাকুরমহাশয়ের কথা থেকে বোঝা গেল, আমি যার হয়ে কাঁধ দিয়েছি, সে পিছনে সামাল দিচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরমহাশয়ের মুখে, সকলের নামই বিশেষভাবে উচ্চারিত। দুগ্গোর সঙ্গে দেবী জোড় খেয়েছে। সম্মানের থেকে স্নেহ প্রীতিই যেন বেশি। আর একটু ভেঙে বললে, আদর সোহাগ বলা যাবে কী?

যাক গিয়ে। তা ভেবেই বা আমার লাভ কী? এটুকু বুঝে, মন কষাকষি যাই থাক, এই বাহিকারা আর ঠাকুরমহাশয়, অভিন্ন না। এক দলের দলী। মুখ ঝামটা ঝংকার বিদ্রূপ, যতোই আওয়াজ দিক। কথা যা তা নিজেদের মধ্যে। কথায় বলে, এমনি কি আর বাবা বলি? গুঁতোর চোটে বাবা বলি। আমি সেই হিসেবে বাবা হয়েছি। দলের সঙ্গে বে-দলী দেব আর কাকে বলে।

এই সময়েই হাঁক-ডাক হইচই হাসি হাততালি শুনতে পেলাম। আওয়াজ আসছে উত্তর থেকে। মাথা তোলবার উপায় নেই। কোনোরকমে চোখ তুলে দেখি, সাঁকোর ওপরে জনতার ভিড়। শ্মশানযাত্রায় মৃতের প্রতি এমন হাসি হাততালির আপ্যায়ন কখনও শুনিনি, দেখিনি। নাকি, নারীলোকের শববহনের আজব কাণ্ডের মজার খুশিয়ালি। হতেও পারে। পিছনের ধুলিঝাড়াগুলো এবার দৌড়ে সাঁকোর দিকে উঠছে, ওদেরও হইচই হাততালি হাসি।

আমার মনটা কেমন অস্বস্তিতে ভরে উঠছে। কী আতান্তরে যে পড়েছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। সব ব্যাপারটাই আজব। সাঁকোর ওপর থেকে তখন, হাসি হাততালির সঙ্গে, চিলের ডাকের মতো শিসও শুনতে পাচ্ছি। পুরুষের গলার চিৎকার শোনা গেল, 'এস গো এস। কলির খেলা তোমরাই দেখালে বটে!'

চালি নিয়ে আমরা সাঁকোর ওপরে উঠলাম। নীচে বিশীর্ণা সরস্বতী। যেমন তেমন সাঁকো না, লোহার বিমে, চওড়া ঝুলন্ত সাঁকো। রাস্তা থাকলে অনায়াসে গাড়ি চলতে পারতো। কিন্তু সাঁকোর দু পাশে ভিড়। জনতার চেহারাটাও কেমন একটু মন চমকানো। রিকশাওয়ালা, ভবঘুরে, রকের আড্ডাবাজ, এমন শ্রেণীরই বেশি। তাদের সঙ্গে মিলে মিশে কিছু রমণীর দল। যাদের দেখলে কেমন ঠেক লেগে যায়, ভুরু কুঁচকে ওঠে। কেউ শাড়ি জামায় আলুথালু, ভাঙা খোঁপা, খোলা চুল। চোখের কাজলের থেকেও, চোখের কোলের কালিই গাঢ়। বাঁকা সিঁথেয় সিঁদুর কারো, কারো-বা কপালে কাচপোকার টিপের বদলে, নতুন রকমের নীল কালো টিপ। বয়স তাদের নানা প্রকারের। চোদ্দ থেকে চল্লিশ ছাড়াও, পঞ্চাশ উতরে যাওয়া স্ত্রীলোকও আছে।

চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সের এক স্বাস্থ্যবতী ভুরে শাড়ির আঁচল বুকের

ওপর টানতে টানতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো। ভাঙা খোঁপা ঘাড়ে ঝুলছে। কপালের লাল টিপ ঝাপসা আর বাঁকা। রাত্রের কাজল চোখের পাতায় অস্পষ্ট, মুখ নাক কাটা কাটা তীক্ষ্ন। বললো, 'হ্যাঁ গো সন্ধেদিদি, শেষটায় তোমাদের ঘাড়ে করে বয়ে আনতে হলো ?'

'হ্যাঁ, কপালের লিখন ভাই, খণ্ডাবে কে বল ?' সন্ধেতারার গলায় এখন যেন কিঞ্চিৎ জোরের রেশ।

ঠাকুরমহাশয়ের শ্রবণ বড় সতর্ক। কোনো কথা ফসকায় না। বললো, 'হ্যাঁ, কপালের লিখন ছাড়া, আর কী বলা যায় গো, জোয়ান মরদরা সব ঘরে বসে রইলো, কেউ এগিয়ে এলো না। তবে নাটের গুরুটিকে আমিও ছাড়ব না। ভেবেছিল, সবাইকে ফুস মন্তরে ধরে রাখবে, আমাদের শিক্ষা দেবে। তা এবার এসে দেখে যাক, কেমন শিক্ষা দিল ?'

সাঁকোটি নেহাত ছোট না। এখন ভিড় ঠেলে এগোতে হচ্ছে। কোমরে লুঙ্গি জড়ানো, খালি গা শক্ত শরীর, এক মাথা রুক্ষ চুল এক জোয়ান হেঁকে উঠলো, 'অ্যাই খেটো, বংকাকে একবার আসতে বল না, দিদিদের তাগদ দেখে যাক।'

যে-যুবতীটি সন্ধেতারার সঙ্গে কথা বলছিল, সে ভুরু কুঁচকে ঘাড়ে ঝটকা দিল। তাকালো খালি গা জোয়ানের দিকে। ঝংকার দিয়ে উঠলো, 'কেন, বংকাকে ডেকে দেখাবার কী আছে ? খ্যামটা নাচ হচ্ছে নাকি ?'

জোয়ানটির হাসিতে কিঞ্চিৎ ছায়া। বললো, 'এরকম একটা ব্যাপার, একবার দেখবে না ?'

'না, দেখবে না।' যুবতীটির স্বরে ঝংকার তীব্র হলো, 'যার ইচ্ছে হয়, সে নিজে দেখে যাবে। তোমাকে ডেকে দেখাতে হবে না।'

জোয়ানের পাশ থেকে রোগা লম্বা লুঙ্গি জামা গায়ে একজন, কনুই দিয়ে খোঁচা দিল, 'হ্যাঁ, তুই চুপ করে থাক না বেজি। রুকি বোন ঠিকই বলেছে। যার ইচ্ছে হয়, সে নিজে দেখে যাবে।'

সাঁকো পেরিয়ে, বাঁদিকে দেখছি একটা সিনেমা হল। দেওয়ালের গায়ে ছবি দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু কার শব বহন করছি ? এরা কারা ? মনের সব সন্দ ধন্দ কাটিয়ে, একটা ধারণাই ক্রমে যেন মনে চেপে বসছে। পথ চলতে, পথের মাঝে এমন এক অবিশ্বাস্য অভাবিত দায়ও আমার জন্য অপেক্ষা করছিল ? যার অলক্ষ্যের ডাকে আমি ঘর ছেড়ে পথে চলি, আমাকে নিয়ে তার এ কেমন খেলা ?

কে একজন বলে উঠলো, 'কিন্তু এ শালা লাগরটি কে, তা তো চিনতে পারচিনে ?'

'হবে ওদিককারই। সিদ্ধি ঠাকুর পটিয়ে পাটিয়ে নিয়ে এসেছে।' আর একজন জবাব দিল।

অই, হায় রে আমার কপাল। শেষে আমি হলাম শালা লাগর। জিজ্ঞাসা জবাব যে আমাকে নিয়েই, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ঠাকুরমহাশয়ের কান সজাগ। সে বলল, 'না বাবা খেটো, এ লাগর টাগর কেউ না। দুর্গোদেবী আর বইতে পারছিল না, তাই এ বাবাকে পথ থেকে ধরে নিয়ে এসেছি।'

খেটো বললো, 'হু, আমার তাই মনে হচ্ছিল, পিকচার আলাদা, মাইরি সিদ্ধিঠাকুর, তোমার গোড়ে মাথা ঠুকি। বাবাকে পথ থেকে ছিনতাই করলে ?'

'আহা হা, ছিনতাই কেন করব ?' ঠাকুরমহাশয় বা সিদ্ধিঠাকুর, যে-ই হোক, মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'যে সে কি আর এমনি করে কাঁধ দেয় ? বাবার আমার বড় দয়ার শরীর, দেখে বুঝতে পারচ না ?'

দয়ার শরীর শুনলেই মনে হয়, মহাশয়ের ঠোঁটে টেপা কপট হাসি। দয়ার শরীরে কি বোকা বাস করে ?

এদিকে ভুতে ঠ্যালা মারা দুপুরে, ভিড় আর হইচই বাড়ছে। হঠাৎ ডান দিক থেকে, বলতে গেলে এক লাবণ্যবতী, রূপকুমারী ছুটে এলো। মাথার চুল তার ভেজা। ফর্সা মুখে গালে গলায় বিন্দু বিন্দু জলের ফোঁটা, বয়স তিরিশের নিচে, অনুমান এইরকম। শায়ার ওপরে, লাল পাড় তাঁতের শাড়ি কোনরকমে জড়িয়ে এসেছে। পায়ে বাসী আলতার দাগ। বললো, 'ওগো, চাঁদদিদিকে এখেনে একবারটি নামাবে না ?'

আমি ডাইনে চোখ ঘুরিয়ে একবার দেখলাম। ঘিঞ্জি বস্তির ফালি অলি গলি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একপাল স্ত্রীলোক। কারোর বা কোলে সন্তানও রয়েছে। তাদের মুখে হাসি নেই, হই হল্লা নেই। ঠাকুরমহাশয় মাথা নেড়ে বললো, 'ওইটে আর করতে যাস না লতা বোন। এই তো এসে গেচি। টানে টানে চলে যাওয়া ভাল, নইলে আটকে পড়তে হবে। তোদের যাদের মন করে শ্মশানে চলে আয়। না হয় গঙ্গায় আর একবার ডুব দিবি।'

রুকি যার নাম, স্বাস্থ্যবতী এবং নিতান্ত অসহবৎ চালে নেই, বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই যাও, আমরা আসচি। ঐ ভদ্দরলোকটিকেও ছাড়তে হবে তো।'

আমি চোখ ফিরিয়ে তাকাতে চোখাচোখি হয়ে গেল অনেকের সঙ্গে। ভদ্দরলোক! কার শব কাঁধে বইছি, আর বোঝাবার দরকার নেই। ব্রহ্মতালুতে ঠেকে থাকা কৌতূহলের অনেকখানি এখন গলার কাছে নেমে এসেছে। কাঁদতে পারবো না। কিন্তু ভদ্দরলোকের গুষ্টি জাহান্নামে যাক। আমার এখন একমাত্র পরিচয়, বারাঙ্গনার শববাহী। এর পরে আর মস্তিষ্কে ছিদ্র করে বা গিলিয়ে খাইয়ে কিছু বোঝাবার নেই। অন্য এক ব্যাখ্যায় জানতাম, পুরুষস্য ভাগ্যং, স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্। ভাগ্যের কী গতি দেখতেই পাচ্ছি। ভাগ্যের খবরদারি কে করে, জানি না। সে পরিহাসপ্রিয় বটে। অথচ সে নাকি

অসোয়াস্তি। দাবনায় চাপড় মেরে তার সঙ্গে যে লড়ে যাবো, সে-রকম কোনো ঠিকঠিকানা উপায়ও জানা নেই।

কালকূটের প্রাণ বিষ জরজর। অমৃতের ঠিকানা কোথায়? আজও পাইনি। তা বলে দেহোপজীবিনীর শব কাঁধে? এমদাদের কপাল চাপড়ানি, উদ্বেগে মাথা ঝাঁকানি এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু ভাগ্যে কর্মে মেশামেশি। কে ঠেকাবে তাকে। অতএব, চলো হে পথ সুখী। পথের খোয়ারি কাটাও। পথের নেশায় অনেক তো মত্ত মাতাল হয়েছো। মাঝে মাঝে খোয়ারি না কাটালে চলবে কেমন করে।

ঠাকুরমহাশয় বললো, 'ছাড়তে হবে কী গো রুকি ভাই? বাবাকে তোমরা সেবা করবে। বাবা আজ আমাদের উদ্ধার করেছে।'

'তা করব সিদ্ধিঠাকুর, যেমন বলবে তেমনি করব।' রুকি বললো, আমার দিকে চোখ রেখে, 'আমাদের সেবা নিলে, কেন করব না।'

এবার আমারই বলে উঠতে ইচ্ছা করলো, 'মরণ!' আমার কোথায় গতি, কোথায় এলাম, এখন তারই ঠিক পাচ্ছি না। কাঁধে আমার চিত শয়ানে শেষ যাত্রিণী। তাকে যথাস্থানে নামাতে পারলে বাঁচি। এখন আমি সেবা খাবো? কিসের সেবা? কেমন সেবা? কিন্তু মুখ ফুটে তা বলতে পারি না। শুধু জানি, কোনো সেবায় আমার দরকার নেই।

ঠাকুরমহাশয় বললো, 'আগে যাই। বাবার চান ধোয়া হোক। তারপরে মিষ্টি, জল দেবে। আর যদি বাবা তোমাদের হাতে খান, ঘরে এনে তৃপ্তি করে খাওয়াবে।'

শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। আবার এখানে ফিরে ঘরে এসে তৃপ্তি করে খাবো। ভীমরতি তো আসলে বয়সে না, মনে? বোধহয় বয়সেই। সেই বয়সটায় এখনও পেঁছাইনি। সন্ধেতারা তাড়া দিল, 'শোন রুকি, লতু শোন, আমরা এগোই। যা ভাববার তা ওখেনে গে ভাবা যাবে।'

ঠাকুরমহাশয় হাঁক দিল, 'হ্যাঁ, চল, চল, আর দাঁড়ানো নয়।'

আবার চলা শুরু হলো। জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ থেকে ঘাটের একটা নিশানা পেয়েছিলাম। এখন আর পাচ্ছি না। সামনে মিছিল, পিছনে মিছিল। রাস্তার দুধারে লোকের ভিড়। তারা কেউ হতবুদ্ধি, নির্বাক। কেউ হেসে ঢলে টলছে। আর চালি নিয়ে আমরা চলেছি মাঝখান দিয়ে। এখন হরিধ্বনি দেবার লোকের অভাব নেই। এতোক্ষণ যা-ও বা কাঁচা মাটির নিরিবিলি পথ ধরে আসছিলাম এখন সরু পথের ঘিঞ্জি শহরে।

পথ মাপজোকের কোনো প্রশ্ন নেই। সময় কতো, তা দেখবারও অবকাশ নেই। সামনে কিছুটা এগোতেই, একটা বড় রকমের হাঁক ডাক হৈ হুল্লোড় শুনে, চোখের কোণে তাকালাম ডানদিকে। চমৎকার! দেশীয় মদ আর সিদ্ধি গাঁজার দোকান পাশাপাশি। অন্তত দেশী মদের দোকানের সাইনবোর্ডটা

চোখে ফাঁক গেল না। বাকি আর কিছু নেই। বলতে গেলে, সাঁকো পেরিয়েই আর এক ত্রিবেণী সঙ্গম। সেটা যে কেমন বুকে নেবার, বুকে নেবে।

সামনে এগিয়ে তিন মাথার মোড়। আবার ডাইনে বাঁক। সরু রাস্তার দুপাশে জম্পেশ ভিড়। নানারকমের দোকানপাট। সাইকেল রিকশা, গরুর গাড়ি, কিছু বাদ নেই। তার মধ্যে নারীলোকের শববহন, পৃথিবীর এমন আজব কান্ড দেখতে, ভিড়ের ঠেলা বাড়ছে ছাড়া কমছে না। রাস্তা ক্রমে নিচে টানছে। বাঁদিকে চোখে পড়লো প্রাচীন মন্দির। তারপরেই দোকান-পাটের চেহারা আলাদা। যাকে বলে তীর্থক্ষেত্রের আসল ছবি।

সামনে এগিয়ে আবার বাঁদিকে বাঁক নেবার আগেই চোখে পড়লো গঙ্গা। বড় একটি ঘাট। সূর্য কোথায় নিজের অয়নে চলেছে, বুঝতে পারছি না। ঘাটে বেশ ভিড়। ভিড় মানেই, আমাদের ঘিরে আরও ভিড়। দেখছি, ঘাট থেকে মেয়েমদ্দ অনেকে সিঁড়ি টপকে আজব শবযাত্রা দেখতে আসছে। আর কাঁধে কোনো এক চাঁদ জানি না, ঠাকুরমহাশয়ের মুখে এই মৃতা চাঁদদিদি কী নামে সম্বোধিত হতো। হয়তো চাঁদমালা কিংবা চন্দ্রাবতী, কে জানে। তাকে কাঁধে নিয়ে চলতে চলতেও, ঘাটের দিকে তাকিয়ে, কেতাবের অক্ষরমালা আমার মগজে জাগলো। এই ঘাটই কি উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দ-দেবের নির্মিত?

সেটাও ভাবনার কথা। উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব আর মুকুন্দদেব হরিচন্দন কি একই ব্যক্তি? তাও যদি হয়, তবে এ ঘাটের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছু থাকতো না। যদি এ ঘাট, সে-ঘাট হয়, তবে নিশ্চয়ই নতুন করে তার খোল নলচে বদলাতে হয়েছে। বিরাট চওড়া, ব্যবহারযোগ্য ঘাট দেখলে, তাই মনে হয়।

কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সময় নেই। ঠাকুরমহাশয় আমার কাছে এসে বললো, 'এবার বাঁয়ে, হ্যাঁ বাঁয়ে গিয়ে, নিচে গঙ্গার ধারে আসল জায়গা। মহাশ্মশান বলে কথা। এখানে চিতা কখনো নেভে না।' বলে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে বললো, 'চন্দ্রাবলীর এইটুকু সাধ ছিল, সে মরলে যেন ত্রিবেণীর ঘাটে পোড়ানো হয়। আর তার জন্যেই এত হ্যাপা। তা হোক, সাধ আহ্লাদের এই তো সব শেষ, না কী বল বাবা?'

জবাবের প্রত্যাশা আদৌ আছে বলে মনে করি না। জবাব দেবার মতোও আমার কিছু নেই। তবে কানে বাজলো নামের মহিমা। চাঁদ থেকে চাঁদমালা চন্দ্রাবতী পর্যন্ত ভাবতে পেরেছিলাম। চন্দ্রাবলী নামটি মাথায় আসেনি। বৈষ্ণব কাব্যের আর এক নায়িকা। ঘাট পেরিয়ে, ডানদিকে নিচে নামতে হচ্ছে। দু পাশে ভিড়ের চাপ ঠাসাঠাসি। মড়া ছুঁতে নেই, শবযাত্রীদেরও না। ছুঁলেই স্নান করতে হবে, এটাই জানতাম। কিন্তু এ কৌতূহলী জনতার

ভিড় দেখছি, সেসব মানতে রাজী না। আসলে অবাক মজার খুশি। আগে খুশির খোয়ারি মিটুক, তারপরে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে নিতে কী আছে?

ক্রমে নিচে নেমে, আসল স্থান শ্মশানক্ষেত্র। এদিকে বাঁধানো ঘাটের কোনো চিহ্ন নেই। এক দিকে একটি চিতা জ্বলছে। শ্মশানযাত্রীরা আশে-পাশে বসে ছিল। আমাদের দেখে সবাই, হাঁ মুখ অবাক চোখে উঠে দাঁড়ালো। এমন আজব কান্ড তারাও দেখেনি। উত্তর ঘেঁষে কয়েকটি চালা ঘর। সেদিক থেকেও দু-চার মেয়েমদ্দ ছুটে এলো। এরাই বোধহয় আসল শ্মশানবাসী। তাদের হতবাক চোখের নজর দেখলেই বোঝা যায়, এমন শবযাত্রিণী তারাও কখনও দেখেনি।

ঠাকুরমহাশয় হাঁকলো, 'এবার নামাও, চালি নামাও।'

আহ, যেন দৈববাণীর নির্দেশ। একবার সন্ধেতারার দিকে তাকালাম। সে বললো, 'তুমি আগে নামাও বাবা।'

আমি ঘাড় খালি করে, চালির বাঁশ হাতে নিলাম। আস্তে আস্তে চালি নামানো হলো। এখনও ভিড় কাটবার লক্ষণ নেই। না থাকুক, আমার কাজ মিটেছে। প্রথমেই ইচ্ছা হলো, আগে একটু বসি। এমন না যে, জীবনে এই প্রথম শব বহন করে শ্মশানে এলাম। কিন্তু শরীর বলে একটা কথা আছে। কোমর টনটন করছে। প্রথমে চাই একটু বসা, তারপরেই চাই ধূমপান। শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু যেন রাক্ষসের মতো, রক্তশোষা জোঁকের মতো খাই খাই করছে, ধোঁয়া চাই ধোঁয়া চাই।

তা চাই। কিন্তু এখানে কোথাও বসবার ইচ্ছা নেই। একটু নিরিবিলি চাই। এসেই চোখে পড়েছিল, এক চিতা জ্বলছে। আর এক চিতা সাজানো হচ্ছে সেটা লক্ষ্য করিনি। চিতার পাশে শোয়ানো, সেও এক বৃদ্ধা। শাদা ধবধবে ছোট করে ছাঁটা চুল। কুটোকাটি দিয়ে তৈরি পাখির বাসার মতো রোঁয়া জর্জরিত মুখ। চোখ বোজা। ঠোঁট দুটো ফাঁক। সেই শবকে ঘিরে বেশ কিছু মেয়ে পুরুষ। তার মধ্যে এক প্রৌঢ়, বৃদ্ধার শবের পাশে শুয়ে গড়াগড়ি। ভাবছিলাম, কাঁদছে বুঝি। আসলে সে গানের সুরে যা বলছে, শ্মশানে এমন কথাও কদাপি শুনিনি। বলছে, 'মাগো, এত পোটরা প্যাটরা ঘাটালে, একটা পয়সা পেলাম না। পোড়াবার কাঠের খরচা রেখে যাওনি, তাতে কোন দুঃখু নেই। তা বলে মালের জন্য দুটো টাকাও রেখে যাওনি? ও মাগো, তুমি তো জানতে, তোমার ছেলের পেটে মাল না পড়লে, কুটো ভেঙে দুটো করতে পারে না।'

নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কথাগুলো ঠিক শুনছিলাম তো? বৃদ্ধার শব ঘিরে যারা রয়েছে, অনেকটা শহরঘেঁষা মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো দেখছি। তাদের একটি তরুণী চারপাশে তাকিয়ে দেখছে। হাসি চাপতে পারছে না। মুখে আঁচল চেপে চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। এক সধবা মহিলার

নাকছাবিতে ঝলক দিচ্ছে। সুখে না, রাগে। চোখ দপদপ, মুখ শক্ত, নাসারন্ধ্র কাঁপছে। একটি তরুণ বলছে, 'জ্যাঠামশাই, উঠুন। এই নিন, আমি টাকা দিচ্ছি।'

কে কার কথা শোনে। প্রৌঢ় ছেলেটির শোক আর থামে না। 'ওরে, তোদের টাকা পাব জানি, মায়ের টাকায় মাল খেতে পেলাম না, এ দুঃখু কোথায় রাখব।' ···সুর করে বলে, আর ধুলো কাদা মাখা প্যান্ট শার্ট পরা হাত পা তুলে, আঁতুড় ঘরের শিশুর মতো ছোঁড়াছুঁড়ি করছে।

'আহা বেচারীর কী দুঃখ!' ঠাকুরমহাশয় বললো, 'মায়ের টাকায় মাল খেতে পেল না।' ঠাকুরমহাশয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল বেজি। সে বললো, 'সিদ্ধিবাবা, মায়ের খোকাটি খোয়ারি কাটাচ্ছে মনে হচ্ছে?'

'খোয়ারি কি কাটবে? সবে তো জমেচে। পেটে বস্তু আছে, বুঝতে পারচিসনে? নইলে আর অমন করে?' ঠাকুরমহাশয় হেসে বললো, 'একে মাতৃশোক, তায় পেটে বস্তু। ও রকম একটু তো হবেই। কেমন মা-অন্ত প্রাণ বল দিকিনি? পোড়াবার টাকা রেখে যায়নি, তাতে দুঃখু নেই, তা বলে মাল খাবার জন্য দুটো টাকা রেখে যাবে না?'

বেজির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল খেটো। সে হেসে এক চোখ বুজে ইশারা করে বললো, 'তোমার কিন্তু সে দুঃখু নেই সিদ্ধিবাবা। চাঁদদিদি তোমার জন্য অনেক মাল খাওয়ার টাকা রেখে গেচে।'

'মায়ের সঙ্গে চন্দ্রাবলীর কথা আসে কেন?' ঠাকুরমহাশয়ের সদাহাস্য মুখে এই প্রথম বিরক্তি দেখতে পেলাম। চাপা গলায় খেঁকিয়ে বললো, 'আমার মা আমাকে বুকের দুধ দিয়েই যেতে পারেনি, তায় আবার মালের টাকা। মিছিমিছি আমার পাছায় কাটি দিতে আসিসনে খেটো, মেজাজ খারাপ করে দিসনে।' কোমরে জড়ানো পশমী চাদরটা খুলে ঝাড়া দিল। আবার জড়ালো। মহাশয় তুক করলো নাকি?

বেজি আর খেটো চোখাচোখি করে হাসলো। শ্মশানের অধিকাংশেরই নজর, মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া প্রৌঢ় লোকটির ওপর। শ্মশানে লোকে কেবল কাঁদতে আসে না। ঘটনার ঘূর্ণিতে হাসির উচ্ছ্বাসও ছলকায়। যে-মহিলাটির রাগে ক্ষোভে নাকছাবিতে ঝলক দিচ্ছে, তিনি বোধহয় মায়ের টাকায় দ্রব্য না খেতে পারার শোকগ্রস্তের পত্নী। বাকি মহিলা পুরুষদের মুখে শোকের ছায়া। কিন্তু লোকের মজার হাসি দেখে, লজ্জা পাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলিও হচ্ছে।

ভালো কিংবা মন্দ, কইতে পারি না। খ্রীষ্টান মুসলমানের সমাধিক্ষেত্রের নীরবতা শ্মশানে নেই। থাকেও না। এখানে কান্না বাজনা সব একসঙ্গে। হ্যাঁ, খোল করতালের বাজনাও বাজে। এখন অবিশ্যি বাজছে না। কিন্তু শ্মশানবাসিনী ডোম্বিনী, না কি, কী বলবো, দুটি বউ তো উত্তরের সীমানায়

দাঁড়িয়ে হেসে বাঁচছে না। ওদিকে তাদের একজনের তিন চার বছরের ধুলোকাদা মাখা মেয়েটি মায়ের আঁচল ধরে চিৎকার করে কাঁদছে। তা কাঁদুক। মজা দেখা ফুরিয়ে যাবে না? কিন্তু মহাশ্মশানের উত্তরাধিকারীরা কেউ বসে নেই। উত্তরের ধারে চালার ঢাকায় কাঠের স্তূপ। গদীতে মহাজন আসীন। সেখানে লেনদেন চলছে। চিতা সাজাবার দায়িত্ব যাদের, তারা কাঠ বহে আনছে। পুরোহিত মহাশয়ের তাগাদা। বিশেষ করে, যাদের বৃদ্ধা শবের পাশে, প্রৌঢ় ছেলের কান্নাকাটি চলেছে।

আমার কাজ শেষ। কাজ? কার কাজ কে করলো, জানি না। একটি সিগারেট ধরিয়ে, একবার কাছে রাখা শবের দিকে তাকালাম। যাকে বয়ে আনলাম, একবার তার মুখটা ভালো করে দেখে যাই। চার বাহিকা বসে ছিল শব ঘিরে। কারোর বা মাথায় হাত, কারোর কোলে আর মাটিতে। দেখেই বোঝা যায়, তাদের ঘাড় কোমরের ব্যথা এখনও মরেনি। বুকে হাপর টানছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কী সব কথা চলছে। তার মধ্যেই, প্রৌঢ় ছেলেটির কান্না শুনে, ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে রাখতে পারছে না।

চাঁদদিদি আর চন্দ্রাবলী; যে-ই হোক, তার মৃত মুখের ফরসা রঙ এখন ফ্যাকাসে। বয়স শববাহিকাদের মতোই ষাটের কাছাকাছি। কপালের সামনের চুলে অল্পস্বল্প পাকের রঙটা রুপোলি না। নতুন তারের মতো। এদের জীবনে বৈধব্য আছে কী না, সেই গূঢ় তত্ত্ব জানা নেই। আপাতত দেখছি, মৃতার সিঁথায় কপালে সিঁদুরের ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে চন্দনের ছড়া। নীরক্ত ফ্যাকাসে মুখের চামড়ায় টান ধরেছে। কিন্তু বয়সের রেখা তেমন পড়েনি। বরং গোল মুখ দেখলে মনে হয়, ভোগে সুখেই ছিল। রোগভোগের শীর্ণতা নেই। দড়ি জড়ানো কাপড় ঢাকা অঙ্গ দেখলেও বোঝা যায়, চন্দ্রাবলী হাড়ে মাংসে দোহারা ছিল। বাহিকাদের আর দোষ কী। কম ওজনটা বহন করতে হয়নি।

প্রাণহীন মুখেও কি জীবিতকালের চিহ্ন কিছু থাকে। অন্তত চোখে মুখে থাকে। বোজা থাকলেও দেখছি চন্দ্রাবলীর চোখের ফাঁদ ছিল বড়। নাক টিকলো।··শুকনো ফ্যাকাসে ঠোঁট ঈষৎ পুষ্ট। তারপরেও কেমন যেন মনে হয়, এখনও কিঞ্চিৎ দেমাকের ভাব ফুটে রয়েছে। কিংবা আমার নজরে গোল। তবে এই মুখ দেখে অনায়াসে বলা যায়, রূপের কিছু চটক ছিল। সেই চটকের ঝটকায় অনেক মাথা ঘুরেছে।

চন্দ্রাবলীর পেশা কি ছিল, এখন আর তা অজানা নেই। সংসারের পথ চলতে, এ জীবনের ধারা কার কেমন, সংসারের প্রান্তে দাঁড়িয়েও কিছু দেখা যায়। জানাটা সামান্য। অথচ মূলের বিষয়টা অজানা নেই। অভিজ্ঞতা আছে এমন বললে মুখে পটপটানি সার। হাতছানি দিয়ে যে-ই ডেকে নিয়ে যাক কাছে আর দূরের পথে, সমাজের বুড়ী ছোঁয়াটা জন্মকালের দান। সে

আমাকে ছাড়েনি। আমিও তাকে কোনোদিন ছাড়তে পারিনি। 'নিষিদ্ধ'-এর বেড়িটা চিরদিন পায়ে পায়ে ফিরেছে। তাকে ভেঙেচুরে সীমা টপকাতে পারিনি।

এটা হলো মনের বেড়ি। বাস্তবে কিছু দেখিনি, বললে মিথ্যাচারণ হয়। মনের উদারতায় সুড়সুড়ি দিয়ে বা কী লাভ। কৌতূহলের বান ডেকেছে। সংস্কারের চোরা বান টেনে নিয়ে গিয়েছে সীমান্তের বাইরে। অথচ, চিরকালই দেখে এসেছি, ঘরের সামনের দরজা খুলে এক পথে বেরিয়ে গিয়েছি। সেটা আমাদের সদরের সামাজিক দরজা। পিছনে অন্য ঘরের দরজাটার বাস বেসাতি থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছি। শহর মফস্বল, এমন কি রাঢ়বঙ্গের গ্রাম-জীবনেও, জীবন যাপনের এ ছবিটা কে অস্বীকার করবে।

না, এখন আর আক্ষেপ বিক্ষেপ নেই। কে এই চন্দ্রাবলী, কোথায় ছিল, কোথা থেকে এসেছিল বারো বাসরের অঙ্গনে, জানবার কোনো কৌতূহল নেই। কে জানে, আছে কিংবা ছিল কী না স্বামীপুত্র। জানি না, এখনও তার গায়ে লেখা আছে কী না, সে ছিল বারবণিতা। এই শ্মশানভূমিতে সবাই দেখছি সমান। তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুও বুঝতে পারছি না, সে এক মানবী ছাড়া আর কিছু। মনে মনে বলতে পারি, দৈব নাহি খণ্ডনে যায়। অতএব, গন্তব্যের কিছু বাকি পথে, আমার কাঁধ ছিল তোমার জন্যে। তোমার খেলা সাঙ্গ। তুমি যাও। আমার খেলা সাঙ্গ করে আসছি।

'বড় আশা ছিল, ত্রিবেণীর ঘাটে যেন গতি হয়।' ঠাকুরমহাশয় আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললো।

চমকেই উঠেছিলাম। বুঝেছিলাম ঠিক, লোকটির চোখে কিছু ফাঁক যায় না। বোধহয় আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখেই, কৈফিয়তটা মনে এসেছে। যদিও তার দরকার ছিল না। আমি বললাম, 'এবার চলি।'

'ছি ছি, তাই কি হয় বাবা?' ঠাকুরমহাশয় একেবারে শশব্যস্ত হয়ে উঠলো, 'চলে যাবে কি? একটু বস। জিরোও। এভাবে চলি বললেই কি ছেড়ে দেওয়া যায়?'

নতুন গাওনা শুনছি। ছেড়ে না দেওয়ার কী আছে। আমাকেও কি চালিতে উঠতে হবে নাকি?

সন্ধেতারা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কোথাকার ছেলে, কোথায় যাচ্ছিলে, কিছু জানলাম না বাবা। সে-কথা এখন থাক। মড়া বয়েচ, চানটান করবে। যত তাড়াই থাকুক, আগে একটু চা খাও।'

'হ্যাঁ, যা বাবা খেটো।' সিদ্ধিবাবা বললো, 'নইলে বৌজিই যা, বাবার জন্যে একটু চা নিয়ে আয়। আমার জন্যেও একটু আনিস, দুফোঁটা গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে আনিস, নিরম্বু উপোসের দোষটা কেটে যাবে। তোমরা কেউ খাবে নাকি গো? তোমাদের চা খেতে তো দোষ নেই।'

চারুবালা তার কোমরের কাছ থেকে হাত তুলে বেজির দিকে বাড়িয়ে দিল, 'এই নাও পয়সা। সবার জন্যেই নিয়ে এসো।'

মিথ্যা বলবো না, এ রকম একটা তৃষ্ণা জিভের তালুতে এসেও নিজের অগোচরে ছিল। ঠাকুরমহাশয় না বললেও বিদায় নিয়ে আগে নিশ্চয় চায়ের ধান্দায় যেতাম। এখনও তাই যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু প্রস্তাবটা এলো ঠাকুরমহাশয়ের কাছ থেকে। অথচ একটু নিরিবিলি একলা হতে চাই। বললাম, 'থাক না। আপনারা এখানে খান, আমি দোকানে যাচ্ছি।'

দুর্গাদেবী বসে থেকেই জোড় হাত বাড়িয়ে বললো, 'ঐটি হবে না বাবা। আগে একটু চা খাও। তোমার দয়ার শরীরে অনেক করেচ। নেয়ে ধুয়ে শুদ্ধ হও, কিন্তু চাঁদকে চিতেয় তোলার পরে যেও।'

জোড়হস্তের আবেদনে কাপট্য নেই। কিন্তু এ আবার কেমন আবদার? চাঁদকে চিতায় তোলা পর্যন্ত আমাকে থাকতে হবে কেন। এও কি নিয়মের মধ্যে পড়ে নাকি? আমার মুক্তবেণী পাক দিয়ে উত্তরে উজানের টানে দেখছি, জোয়ারের ভরাডুবি। কাঁধের ঝোলায় আমার জামাকাপড় আছে। নেয়ে ধুয়ে 'শুদ্ধ' হবার দরকার নেই। তবে ডুব দেবার দরকার আছে। নইলে শরীরের অস্বস্তি যাবে না। কিন্তু জামাকাপড় ধুয়ে শুদ্ধ করার কোনো বায়ু নেই।

ইতিমধ্যে খেটো পয়সা নিয়ে দৌড় দিয়েছে। বেজি ওর শক্ত শরীরটা নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, 'চা ছাড়া অন্য কিছু যদি চলে, তাও এনে দিতে পারি।'

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মুখে হাসি আছে বটে, কথাটা হাস্যাত্মক না। 'অন্য কিছু' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছে, তাও জানি। তবু আমার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। সন্ধেতারা বললো, 'জানিসনে, চিনিসনে, কাকে কী বলিস? একবার চেয়ে দ্যাখ তারপর মুখ খোল।'

বেজি বড় বাধ্য ছেলে। সত্যি আমার মুখের দিকে তাকালো। তার জীবনযাপন চালচলনটা যে একেবারে বুঝতে পারি না, এমন না। তবু তাকিয়ে দেখাটা হাস্যকর। বললো, 'মনে কিছু করবেন না দাদা। মাসী বলছে বটে, কিন্তু দেখে কি মানুষ চেনা যায়? ওই দেখুন তো, মানুষটার কী অবস্থা?' হাত দিয়ে দেখালো সেই মায়ের টাকায় দুব্যহারা প্রৌঢ় মানুষটিকে।

সন্ধ্যেতারার দলও হেসে উঠলো। তাদের মধ্যেই কে একজন বললো, 'মরণ! শ্মশানে এমন র‍্যালা দেখিনি বাপু।'

কিন্তু ইতিমধ্যেই আরও দুই যুবকের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা টেনে তুলেছে প্রৌঢ়কে। দুজনের মুখই শক্ত, আর শক্ত হাতেই টেনে নিয়ে চলেছে

বাঁধানো ঘাটের পথের ওপরে। প্রৌঢ়ের কান্না তবু থামবার না, 'ওরে, তোরা আমাকে হাজার টাকার মাল খাওয়ালেও, এ শোক আমার যাবে না। আমি যে জানতাম, মা আমার অনেক টাকা রেখে গেছে।'

যুবকদের মুখে কোনো কথা নেই। জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রৌঢ়ের নিজের চলবার ক্ষমতা নেই। দুব্যগুণেই টলমল। তার ওপরে কোমরের পাতলুন নেমে পড়েছে অনেকখানি। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। কাদা মাখামাখি। ঠাকুরমহাশয় বললেন, 'হুঁ, ঐটি হলো আসল কথা। দু টাকার মালের শোক নয়, মায়ের অনেক টাকার খোঁজ। এবার বুঝতে পেরেছি।'

'টাকার কথা তুমি বুঝবে না?' চারুবালা হঠাৎ ঠোঁট বাঁকিয়ে মুখঝামটা দিল।

লক্ষ্মীমণি হাত তুলে সামাল দিল, 'থাক সন্ধে, এখন ওসব কথা থাক।'

ঠাকুরমহাশয় তেমন বিচলিত না। হাসিমুখে চুপচাপ। অনেকটা, হেসে ওড়াও দাদা। ওসব কথায় কান দিও না। এমন মুখঝামটা ঝংকার, সেই চালিতে কাঁধ দেওয়া ইস্তক শুনে আসছি। এদের সঙ্গে ঠাকুরমহাশয়ের সম্পর্কটা কী, তা ধরতে পারিনি। এখন টাকার কথায়, চারুবালার ঝাঁজের খোঁটায়, কেমন একটা ঈনিঝিনি ছায়া। ঈনিঝিনি বেলার মতো, যাকে বলে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। তবে অনুমান তো আগেই করেছি। আঁতের বাসায় মাখামাখি, দাঁতে কাটাকাটি। কিন্তু এদের কাছে এখন আমার আসল জিজ্ঞাস্য, চন্দ্রাবলীর চিতায় ওঠা পর্যন্ত আমাকে থাকতে হবে কেন? মুক্তবেণীর এলাকায় থাকি আর যেদিকেই পা বাড়াই, সেটা আমার খুশি। চালিতে কাঁধ দিয়েছি। দাহকৃত্যে আমার কোন্ কর্ম? চিতা দেখতে থাকবো কেন?

যদিও জানি, পথ চলার ছকটা কোনোকালেই বাঁধা যায় না। বাঁধতে গেলেই, কে কোথা থেকে এসে যেন সব এদিক ওদিক করে দিয়ে যায়। ভালোর দিকে বা মন্দের দিকে, কথাটা জাগে জীবনের গতিবিধি দেখে। কিন্তু চন্দ্রাবলীকে চিতায় তোলা দেখার সাধ নেই।

কথাটা ভেবে কেন যেন চন্দ্রাবলীর মুখের দিকে নজর গেল। একে বলে বিভ্রম। চিতায় ওঠবার আগে সে নিশ্চয় চোখ তাকিয়ে মাথার দিব্যি দেবে না, 'তোমার দয়ার শরীর, থেকে যেও।'…দুর্গাদেবীর কথাটা ঠাকুরমহাশয়কে বলা দরকার। আগে থেকেই পথ পরিষ্কার করে রাখি।

'এই যে বাবা খেটো, এনিচিস?' ঠাকুরমহাশয় মুখ ফিরিয়ে বললো।

আমিও মুখ ফিরিয়ে দেখলাম। না, মাঘের শীতের কথা আর সবার দিকে তাকিয়ে বলবো না। দেখলাম, হাফ প্যান্ট পরা আদুর গায়ে খড়ি ওঠা একটা ছেলে। ডান হাতে কালিপোড়া একটা কেতলি। বাঁ হাতে

একটার ওপরে আর একটা বসানো একগাদা ঝাপসা কাঁচের গেলাস। খেটোর হাতে আলাদা একটা চা ভরা গেলাস। ঠাকুরমহাশয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নাও বাবা সিদ্ধিঠাকুর, এইটে তোমার চোনা মেশানো চা।'

'চোনা মেশানো মানে?' ঠাকুরমহাশয়ের লাল চোখে ভ্রূকুটি।

খেটো হেসে বললো, 'গঙ্গাজলের ছিটে দেওয়া। গরুর চোনা আর গঙ্গাজলে ফারাক তো নেই। তাই বললাম।'

'দেখিস বাবা, তোদের কিছু বিশ্বাস নেই।' ঠাকুরমহাশয় হাত বাড়িয়ে গেলাস নিল। আগে নাক বাড়িয়ে গন্ধ নিল।

আমার তখন অন্য ভাবনা। শববাহীদের সঙ্গে খেটোর ছোঁয়াছুঁয়ি বাকি ছিল না। ঠাকুরমহাশয় এতক্ষণ ছোঁয়া বাঁচিয়ে, খেটোর হাত থেকে গেলাস নিল। ভুলে গেল নাকি? আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'ছুঁয়ে ফেললেন?'

ঠাকুরমহাশয় অবাকও হয়। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কিসের ছোঁয়া বাবা?'

আমি খেটোর দিকে একবার দেখে নিয়ে বললাম, 'এই আমাদের।'

এই প্রথম ঠাকুরমহাশয়ের কথার ধরতাইয়ে আর নজরে ঈষৎ ঠেক লাগলো। তারপরেই তার লম্বাচওড়া শরীরের মতোই হা হা হাসি। বললো, 'অ, ওই ছোঁয়াছুঁয়ির কথা বলচো? তাই বল। এখেনে তো বাবা আর ছোঁয়াছুঁয়ির কিছু নেই। এখেনে এসে যখনই পা দিয়েচি, ওসব ঘুচেচে। তবে হ্যাঁ, পুরুতের কাজ আমার, মড়া বইতে পারিনে। ওতে যজমানের অকল্যেণ, বুঝলে না?' একবার চোখের ইশারায় শববাহিকাদের দেখিয়ে দিল, 'এখন তো কাজেই লেগে যাব। ছোঁয়া বাঁচাবার কোনো কথা নেই। একেবারে কাজ মিটিয়ে নাওয়া ধোয়া।'

'ঢঙ দেখে বাঁচিনে।' সন্ধেতারা ঘাড়ে একটা ঝটকা দিল, ন্যাকামো, আয় খটে, চা নিয়ে চল ওই গাছতলায় গে বসি। এসো বাবা, তুমি এসো।' আমার দিকে তাকিয়ে ডাকলো।

বোঁজ বললো, 'সেই ভাল। কিন্তু তোমাদের একজনকে চালি ছুঁয়ে থাকতে হবে না?'

'আমি আচি বাবা, তোরা যা।' দুর্গাদেবী বললো, 'তবে আমাকে একটু চা দিয়ে যা।'

খেটো ছেলেটার গেলাসের থাক থেকে একটা গেলাস তুলে নিয়ে বললো, 'নে, চা ঢাল।'

ছেলেটি চা ঢেলে দিল। খেটো দুর্গাদেবীর হাতে গেলাস ধরিয়ে দিল। লক্ষ্মীমণি আমাকে আবার ডাকলো, 'এসো বাবা।'

দেখলাম, উত্তর-পশ্চিমের বাঁদিকের উঁচুতে, একটি গাছের তলায় সবাই

এগিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরমহাশয়কে দুর্গাদেবীর কথাটা বলার অবকাশ পেলাম না। চায়ের তৃষ্ণা মিটিয়ে নিই, তারপরে জানানো যাবে।

তিন বাহিকা মাটির ওপর বসলো। বোঁজর সঙ্গে আদুর গা চা-ওয়ালা ছেলেটি। আমি একটা জায়গা ঠিক করে বসবার জন্য এদিক ওদিক তাকালাম। চারুবালা বলে উঠলো, 'এই দেখ, আসন-টাসন কিছু নেই, বাবাকে বসতে দেব কিসে?'

'তাও তো বটে।' সন্ধেতারা বিব্রত ব্যস্ত হলো, তাকালো বোঁজর দিকে।

বোঁজর পরণে লুঙ্গি আর বুকখোলা একটা জামা। খেটোর গা খালি। আমার নিজের পাঞ্জাবির ওপরে অবিশ্যি চাদর আছে। কিন্তু আমিই ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'আসনের দরকার নেই, আমি মাটিতেই বসছি।'

শববাহিকারা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় করলো। বোঁজ বললো, 'কেষ্টদার দোকান থেকে একটা কিছু চেয়ে নিয়ে আসব?'

'কোনো দরকার নেই।' আমি আরও ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'আমি ঠিক বসে যাচ্ছি।'

সন্ধেতারা বললো, 'বল তো আঁচল পেতে দিই বাবা। এই কাঁচা মাটিতে বসা তোমাকে মানায় না।'

আমি সন্ধেতারার দিকে তাকালাম। সন্দেহের খোঁচা একটু লেগেছে বইকি। কিন্তু সেটা আমার মনের ইনিঝিনি বেলা। পেশার পরিচয়টা জানা না থাকলে, হয়তো সন্দেহের খোঁচাটা লাগতো না। তাকিয়ে দেখছি, অকপট মুখেও একটি ব্যস্ততা। নিরীহ দৃষ্টিতে অমায়িক অনুরোধ। আগে দেখেও বুঝতে পারিনি, এখনও পেশার লিখন কোথাও লেখা নেই। বরং এই সরল আতিথেয়তায় আমি একটু সহজ হতে পারলাম। হেসে বললাম, 'কাকে কোথায় মানায়, কে বলতে পারে বলুন। মাটিতে আজ নতুন বসছি না।'

সন্ধেতারার থেকে হাতখানেক ফারাকে বসে পড়লাম। কাঁধের ঝোলাটা টেনে নিলাম কোলের কাছে। ভার একটু কমলো। খেটো বললো, 'দে, চা দে।'

সন্ধেতারাই বললো, 'তা যা বলেচ বাবা। কাকে যে কোথায় মানায়, তা কেউ বলতে পারে না। নইলে তোমাকে কে আজ আমাদের সঙ্গে মানিয়ে জুটিয়ে দিলে?'

এ কথার জবাব জানা নেই। আদুর গায়ে খড়ি-ওঠা ছেলেটা কাঁচের গেলাসের থাক আগে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। ভাবলাম, আগে বাহিকাদের দিতে বলি। সমাজের সহবত সেটাই। শ্মশানে মশানে আর সমাজ সামাজিকতা কিসের। গেলাস একটা তুলে নিলাম। ছেলেটা কালি-

তোবড়া কেতলি থেকে গেলাস ভরে চা ঢেলে দিল। গন্ধ যেমনই হোক, গরম আছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে গেলাস ধরতে হলো। তারপর জনে জনে চা।

আমি চুমুক দিয়েই বুঝলাম, এ হলো মহাশ্মশানের চা। মহাশ্মশানের চিতা যেমন কখনো নেভে না, এখানকার চায়ের দোকানের চায়ের হাঁড়িও কখনো ঠাণ্ডা হয় না। তা সব সময়েই টগবগিয়ে ফোটে। ডাক পড়লেই ঢালা ওপর। মিষ্টি আছে, দুধও আছে, চা আছে কী না জানি না। কিন্তু চুমুক দিতেই অমৃত। মাঝে মাঝে অমৃতের স্বাদ বোধহয় এমনি করেই পাওয়া যায়। তার জন্য মহৎ কিছুর দরকার হয় না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে একটা চিতার আগুনের ওপারে, গঙ্গার মাঝ বরাবর সুদীর্ঘ ভাসমান চরটি চোখে পড়লো। বাঁশবেড়ের চরের থেকে এ চর বড়। দূর থেকেও দেখছি। লোকজনের ভিড় বেশি। মসুর কলাই আলু যেন দূরে থেকেও চিনতে পারছি। চালাঘরের সংখ্যাও কেবল বেশি না। একটা গরুকে দেখছি, শ্মশানের কূলে তাকিয়ে আছে। গলার দড়ি খোঁটায় বাঁধা। তার মানে, ত্রিবেণীর চর আরও জমজমাট। জলে ভাসা সবুজ চরটি উঁচুও বটে। সহজে ডোববার না। একি সমুদ্রের বালি, না কি পাহাড়ের মাটি। গঙ্গার বুক জুড়ে কেবল মাথা চাড়া দেওয়া চরের সারি। গঙ্গা শুকায়, না পথ বদলায়? কথায় বলে, মন না মতি। নদী কবে স্থির থেকেছে? তার গভীরের মন-মতির খবর যারা জানে, তারা বোঝে। আমরা দেখি, মান্ধাতা আমলের বইয়ে আঁকা মানচিত্র বদলে যাচ্ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা ভার।

এককালে যাদের কাছে এ জায়গা ছিল তিরপানী, তারাবানী আর ফিরোজাবাদ, বন্দরে তীর্থে একাকার, গঙ্গার বুকে এমন সারি সারি চরের বহর তারা স্বপ্নেও দেখেনি। কবিদের তো কথাই নেই। কেবল প্রাচীনদের সম্পর্কেই কথাটা মনে এলো না। রবিঠাকুরও তো এই পথে জলভ্রমণ করেছেন। তাঁর শিলাইদহের যাত্রা নিশ্চয়, এ পথেই পদ্মায় গিয়ে মিশেছে। এমন চর দেখেছিলেন কী?

'হ্যাঁ বাবা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?' পাশ থেকে সন্ধেতারা বলল।

আমি মন গুটিয়ে, চোখ ফিরিয়ে বললাম, 'কী, বলুন?'

'কোথা থেকে আসচিলে বাবা, যাচ্ছিলেই বা কোথায়?' সন্ধেতারার চোখে অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা। কানের কাছে কিছু পাকা চুল, তবু কানে দুটো সোনার ফুল। নাকে নাকছাবি। হাতে দুচারগাছা চুড়ি, শাঁখা, লোহা। বাঁ হাতের অনামিকায় রুপোর আংটিতে লাল প্রবাল। সিঁথিতে সিঁদুর। চোখের কোল বসা, মুখে ক্লান্তির ছাপ।

কিন্তু এইখানেই মুশকিল। পথে বেরিয়ে, এ কথাটার জবাব কারোকে কোনোদিন দিতে পারিনি। আর জিজ্ঞাসাটা তো কেবল সন্ধেতারার না। চারুবালা লক্ষ্মীমণিও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। খেটো আর বোঁজ নিজেদের কথায় ব্যস্ত। মিথ্যা কথা তৈরি করতেও সময় লাগে। তবু বললাম, 'ত্রিবেণী হয়ে নবদ্বীপ যাবো।'

অথচ নবদ্বীপের চিন্তা আমার মাথায় ছিল না। সন্ধেতারা বললো, 'এখেন থেকে রেলগাড়ি চেপে যাবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আসচিলে কোথা থেকে? চুঁচড়ো না হুগলি?' সন্ধেতারার জিজ্ঞাসায় মোটামুটি এইরকম ধারণা।

বললাম, 'ঐ আর কি, কাছেপিঠে থেকেই।'

জবাবটা স্পষ্ট হলো না জানি। সন্ধেতারা তার সঙ্গিনীদের সঙ্গে একবার চোখাচোখি করলো, বললো, 'তা বাবা, যেটুকু বলার তাই বলবে, তার বেশি আর বলবেই বা কেন। নবদ্বীপে নিজের লোক আছে বুঝি?'

তাও বটে। নিজের লোক না থাকলে, কেউ আবার কোথাও যায় নাকি? মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'আছে।'

'আর আমরা তোমাকে কী গেরোয় ফেললাম বল দিকি?' সন্ধেতারা বিব্রত আর সংকুচিত, 'তা বাবা, তোমার গাড়ি কখন?'

মিথ্যা কথার ভরাডুবি এইখানে। মিথ্যার স্বরূপ মিথ্যা। একটার পিছনে আর একটা আসে। নবদ্বীপে যেতে হলে ত্রিবেণী থেকে ট্রেনে যাওয়া যায়। এ কথাটা জানা ছিল, সময়ের কথা তো জানি না। বলতে হলো, 'গাড়ির সময়টা ঠিক জানিনে, খোঁজ নিতে হবে।'

'ছি ছি ছি, কী গেরো বল দিকিনি।' চারুবালা বলে উঠলো, 'গাড়ি না পেলে আমাদের জন্য তোমাকে না ইস্টিশনে পড়ে থাকতে হয়।'

হেসে বললাম, 'মানুষের তো কতো কিছুতেই পড়তে হয়। আপনাদের সঙ্গে দেখা না হলেও আমার গাড়ি ফেল হতে পারতো।'

'হ্যাঁ, একে বলে দয়ার—।' লক্ষ্মীমণির কথাটা শেষ হলো না। কাসির দমকে আটকে গেল।

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম লক্ষ্মীমণির মুখ একেবারে পশ্চিমের উল্টো দিকে ফেরানো। তার মুখের কাছ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আগুনে কোথায় লেগেছে, তা জানি। অগ্নিকাণ্ডের ভয় নেই। লক্ষ্মীমণির ধোঁয়ার গন্ধেই টের পেয়েছি। চিতার ধোঁয়ার গন্ধ ছাপিয়ে, সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ স্পষ্ট। এক্ষেত্রে জীবিকার কথাটা আগে আসে। কিন্তু স্ত্রীলোকের ধূমপানে কোনো সমাজের ভেদরেখা নেই। তবে ঐ দয়ার শরীর কথাটা আমার আর শুনতে ইচ্ছা করছে না।

'তা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি বাবা, মনের কথা বলবে তো ?' সন্ধেতারা জিজ্ঞেস করলো।

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। শুকনো ঠোঁটের কোণে সংকোচের হাসি, চোখে দ্বিধা। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছেন বলুন ?'

'বলচি, আমাদের চিনতে তো আর তোমার ভুল হয়নি। এমন একটা দায় নিলে, আমাদের ওপর রাগ করনি তো ?' সন্ধেতারার ঘাড় যেন একটু ঝুঁকে পড়লো।

আমি হাতের শূন্য গেলাস নামিয়ে বললাম, 'প্রথমে আপনাদের আমি চিনতে পারিনি।'

'পারলে বাবা নিশ্চয়ই কাঁধ দিতে না ?' সন্ধেতারার প্রৌঢ়া চোখের তারায় বড় ব্যগ্রতা।

জবাবটা হঠাৎ দিতে পারলাম না। কয়েক মুহূর্ত সময় নিলাম। কিন্তু নিজেকে নির্যাস চিনি, এই বরাতটা নেই। জানলে কী করতাম, জানি না। বললাম, 'তা বলতে পারি না। তবে আপনাদের ঐ ভদ্রমহিলার খুবই কষ্ট হচ্ছিল, সেটা বুঝতে পেরেছিলাম।'

আমার কথা শুনে তিনজনেই আবার চোখাচোখি করলো। আমার দিকেও দেখলো। চারুবালা বললো, 'ও সব ভদ্দর মইলে টইলে বলো না বাবা। আমরা যা, তা-ই।'

হ্যাঁ, এমন একটা ঠেক তো আমার মনেও ছিল। কিন্তু কথা বলতে গেলে, মুখের ভাষাই বেরিয়ে আসে।

'কিন্তু আমি যে কথা জিজ্ঞেস করলাম ' সন্ধেতারার ব্যগ্র চোখের দৃষ্টি আমার দিকে, 'পরে তো চিনেচ। রাগ করনি তো ?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

'ঘেন্না হয়নি তো ?' সন্ধেতারার চোখে এখন দ্বিধা ও তীক্ষ্ণতা।

কথাটা একবারের জন্যও মনে আসেনি। অবাক হয়েছিলাম, নিজের ভাগ্যকে ধিক্কারও দিয়েছিলাম। কিন্তু ঘৃণা আর ধিক্কার, এক কথা না। বললাম, 'সে-রকম কিছু তো মনে হয়নি।'

ভাবছিলাম, আবার নিশ্চয় 'দয়ার শরীর'-এর আওয়াজ শোনা যাবে। কিন্তু সন্ধেতারা বললো, 'বাঁচালে বাবা। মনটা তোমার সত্যি ভাল। তোমার বেশভূষা চালচলন দেখে একবারও ভাবিনি, তুমি সত্যি কাঁধ দেবে। জীবন কাটে একরকম, মানুষ আর কতটুকুনি চিনি।'

অথচ আমার ধারণা, সন্ধেতারারা যতো মানুষ চেনে, আমরা ততো চিনতে শিখিনি। কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা আমার বুক ফেটে এখন ঠোঁটের ডগায় আকুলি-বিকুলি করছে। না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারলাম না, 'তা আপনারাই বা কাঁধে বয়ে আনতে গেলেন কেন ? এ রকম আমি কখনো দেখিনি।' জিজ্ঞাসার

ফাঁকেই একবার চন্দ্রাবলীর চালির দিকে দেখে নিলাম। নজরে পড়লো, দুর্গাদেবী আর ঠাকুরমহাশয় আমাদের দিকে তাকিয়ে কিছু বলাবলি করছে।

সন্ধেতারা আর দুই বাহিকার মুখে হঠাৎ বাক্যি সরলো না। তারাও নিজেদের সঙ্গে চোখাচোখি করে, একবার চন্দ্রাবলীর চালির দিকে দেখলো। চারুবালা বললো, 'সে বাবা অনেক কথা। তা কী আর হয়েচে, বলু না সন্ধে। বাবাকে বলতে দোষ কী ?'

'দোষ আবার কিসের ?' সন্ধেতারার স্বরে দৃঢ়তা, 'গোটা দেশ গাঁ জেনে গেল, আর উবগারি ছেলেটাকে বলতে পারিনে ?' সে আমার দিকে তাকালো। এখন তার মুখ গম্ভীর, একটু বা শক্ত। বললো, 'তোমাকে আর সে সব কথা কি বলব বাবা। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, তোমার ওসব জেনে কাজ নেই। তবু যদি শুনতে চাও, বলতে পারি।'

এই কথাটা শোনার জন্যই, প্রথমে কৌতূহল ব্রহ্মতালুতে গিয়ে বিঁধেছিল। সরস্বতীর সাঁকো পেরিয়ে, অবস্থা দেখে, তখনই কেমন কৌতূহলের খোঁচাটা একটু ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। তবু শোনবার ইচ্ছা একেবারে নেই, তা বলতে পারি না। গণিকার শব হলেও, গণিকাদের কখনও কাঁধে বইতে দেখিনি। বললাম, 'আপনাদের অসুবিধে থাকলে বলতে হবে না।'

'আমাদের আবার অসুবিধে !' সন্ধেতারা হেসে উঠলো, 'কী যে বল বাবা।' সে বিঘতখানেক এগিয়ে এলো আমার দিকে, বললো, 'ত, বলি বাবা শোন। কথায় বলে, ঘরে আমার ভাতার, জার করি কাতার কাতার।'

হুম, শ্রবণটা কেমন চমকে উঠলো। সন্ধেতারা 'জার' বলেনি। তার বদলে যে-কথাটা উচ্চারণ করেছে, তার প্রতিধ্বনি করতে আমি অযোগ্য। আমার কানে মনে যাই ঘটুক, সন্ধেতারা থামেনি। সে তার কথা বলেই চলেছে, 'তা সে-কথা তোমাকে আর কী ভেঙে বলব বাবা। ওই চাঁদ কাঁচা বয়সে এসেছিল চন্দননগরে। তারপরে আমাদের তল্লাটে।'

'আপনাদের তল্লাটটা কোথায় ?' শববহনের দূরত্ব জানবার জন্য প্রশ্নটা মুখে এলো।

সন্ধেতারা হুগলির একটি অঞ্চলের নাম করলো। বাহিকাদের পক্ষে দূরত্বটা বিরাট, সন্দেহ নেই। সন্ধেতারা নিজের কথায় ফিরে গেল, 'তা বাবা একটা কথা, মেয়েমানুষের রূপ থাকলে, যেখেনেই বল, সেখেনেই গোল। আর আমাদের ঘরে পাড়ায় রূপসী জুটলে তো কথাই নেই। তখন সে ভাগাড়ের মড়া। শকুন শেয়ালের কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি। রক্ষে করবার কেউ নেই। চাঁদকে নিয়ে চন্দননগরে মানুষ খুনও হয়ে গেচে। ওরও খুন হবার কথা। তা হলেই ঝামেলা মিটে যেত। ওকে নিয়ে যারা মারামারি

কাড়াকাড়ি করেছে, খুনোখুনি করেছে, তাদের জেল জরিমানাও হয়েছে। তা, এত সব যখন দেখলি, তুই নিজে কেন সামলে চললিনি।'

চারুবালা সন্ধেতারার কাঁধে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বললো, 'ওকথা বলিসনে সন্ধে, বয়েসকালের কথা ভুলে যাসনে। চাঁদের কি তখন সামাল দেবার বয়স ছিল, না মন ছিল? ওকে ঘিরে তখন রাজ্যের বাবুদের র‍্যালা। অমন দিন তোরও গেচে।'

'না, আমার কেন যাবে?' সন্ধেতারা ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল, 'আমার তো আর চাঁদের মতন রূপ ছিল না। তা বলে সামাল দিতে পারবে না কেন? সেই তো দিতে হলো।'

লক্ষ্মীমণি বললো, 'হ্যাঁ হলো, রক্তের জোর যখন কমল। চন্দননগর ছেড়ে যখন আমাদের তল্লাটে পালিয়ে এলো।'

চন্দ্রাবলীর মৃত মুখ এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। তবে অনুমান ঠিকই করেছিলাম। তার এই প্রৌঢ় দেহের স্বাস্থ্য রঙ মুখ চোখ দেখে, আমি কেবল চটকের কথাই ভেবেছিলাম। আসলে সে ছিল গণিকা সমাজের রূপসী। রূপসী প্রমোদার জীবনে কতো পুরুষের আগমন ঘটেছে, তার হিসাব কেউ দিতে পারবে না। স্বয়ং চন্দ্রাবলীরও কি হিসাব জানা ছিল? বোধহয় না। তার মৃত মুখেও আমি যেন একটা দেমাকের ছাপ দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল, জীবনটা তার ভোগে কেটেছে। কিসের ভোগ? কেমন ভোগ?

আমরা একটা মন নিয়ে মানবীর শরীরের শুদ্ধাচারের কথা ভেবেছি। মানবী ভেবেছে আত্মরক্ষার কথা। সেই আত্মরক্ষার সংকল্প দিয়ে, শরীর তার মন দিয়ে বাঁধা। কারণ, সে ধারণ করে। শরীর নিয়ে দায় তার সেই কুঁড়ি ফোটার কাল থেকে। সতীত্ব শুদ্ধাচারের মন্ত্র তার কানে পুরুষ দিয়েছে। সেই আত্মরক্ষার দায়কে নারীত্ব বলে কী না জানি না। পরিবর্তন আর বৈপরীত্য তাকে আত্মরক্ষা করতে শিখিয়েছে। ওটা তার প্রবৃত্তি।

সেই শরীর যখন বারো ঘাটের ডুবুরি ঘাট, তখন সেই ঘাটের ভোগ কেমন—হাসি রঙ্গ উন্মাদনা বিলাসব্যসন যাই থাক, ঘাটের সেই উথালপাথাল জলে ঘৃণা উথলে ওঠে না, এমন বাক্য কেউ কবে না। যা রক্ষা করতে পারিনি, তবে নে সেই ভাগাড়ের মড়া। ভোগের ঝলকানো আলোয়, রাগ আর ঘৃণার ছায়া গাঢ়। কেবল চন্দ্রাবলীর না। আমার পাশে যারা বসে আছে, নিশ্চয় সকলেরই। ধারণাটা নিজস্ব। সত্যি মিথ্যার বিচার তোমাদের।

এমন জীবন কোনো রমণী হাত বাড়িয়ে নেয় না। চন্দ্রাবলীও নেয়নি। অসহায়তা দারিদ্র্য অপমান, যে-অন্ধকার থেকেই সে উঠে আসুক। তারপরে আর সামাল দেবার কী ছিল।

সন্ধেতারার বিশ্বাস, 'কেন সামাল দিতে পারেনি? তুমিই বল বাবা, ওই সেই যে-কথাটা বলছিলাম। রূপ তো তোর চিরকাল থাকবে না,

বয়সও না। ভাতার পুত ছিল না, জার নিয়ে সারা জীবন। তা বেশ তো, দু নৌকোয় পা কেন? সিদ্দিঠাকুরের নৌকোয় পা দিলি তো, আবার অন্যকে ঘাটাল দেওয়া কেন?'

'ঠাকুরের নাম নিচ্ছিস সন্ধে?' লক্ষ্মীমণির অবাক স্বর।

সন্ধেতারার গলায় ঝাঁজ, 'রাখ্, ঠাকুর আমার সাতপাকে ঘোরা ভাতার না। ও মুখপোড়া মিনসের নাম অনেকবার নিয়েচি। ওসব—আমার নেই।'

ওসবের মাঝখানের বিশেষ্যটি উচ্চারণেই ঠেক। সন্ধান যে জান, বুঝহ সে-জন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সিদ্দিঠাকুরমশায় বুঝি আপনাদের তল্লাটেরই লোক?'

'হ্যাঁ বাবা, আমাদের তল্লাটের হাড় জ্বালানো বামুন।' সন্ধেতারা বিরাগ বিরক্তিতে ঘাড়ে একটা ঝটকা দিল, 'বাপের বিস্তর সম্পত্তি ছিল, কোঠাবাড়ি ছিল। শুনি নাকি কোন্‌কালে লেখাপড়া শিখেচিল। যত কাল দেখছি, তার কোন আঁচ পাইনি। মদ মেয়েমানুষ জুয়া ছাড়া আর তো কিছু করতে দেখিনি। ওদিকে দেখ, মা ষষ্ঠীর কৃপায় ঘর ভরতি ছেলেমেয়ে নাতিনাতনী। নিজে একটা ছেলেকে মানুষ করতে পারে নি, একটা মেয়ের বিয়ে দেয়নি। সব উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষটায় আমাদের কাছে। তা আর কী বলব বাবা, অনেক-কালের যাতায়াত, তাড়াতে তো পারিনে। শেষটায় ওই চাঁদের কী মরণ ধরল, ঠাকুরকে ঘাড়ে নিল। তা নিলি, বেশ করলি, আবার সিংবাবুজীকে ঘাটাল দেওয়া কেন? সে তোমাকে অনেক দিয়েচে থুয়েচে, পায়ে ধরে তো সাধতে যায়নি, ও চাঁদ, আমাকে ছেড় না। তার তো আর অভাব নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য সুদী তেজারতির কারবার ভাল। তবে হ্যাঁ বাবা, একটা কথা কী, যার যত থাকুক, সে তত চায়। সিংজীবাবুই বা চাইবে না কেন? ওই দুজনের আকচা আকচিতে আমাদের জীবনপাত।' সন্ধেতারা কাশতে আরম্ভ করলো।

আমি তাকালাম ঠাকুরমশায়ের দিকে। চন্দ্রাবলীর চালির পাশে, দুর্গা-দেবীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে, দুজনেই থেকে থেকে আমাদের দিকে দেখছে। কাছে দাঁড়িয়ে শুনছে খেটো আর বেজি। ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হয়, তাদের কথাবার্তা বা সলাপরামর্শও আমাদের নিয়েই।

এদিকে সন্ধেতারার বৃত্তান্তে, অন্য জগতের এক ঘটনার গাঁট খুলছে। শুকনো গলার কাশি সামলে সে আবার বললো, 'চাঁদ সম্পত্তি তো কিছু কম করেনি। চন্দননগরে হুগলিতে দুখানি বাড়ি করেছে। সোনা দানা নগদও কিছু কম ছিল না। তা সে-সবের হিসেব কেউই পায়নি, আমরা কোন্ ছার। যা পেয়েচে, সবই ওই সিদ্দিঠাকুর। তা বাবা জান তো, বাঁজা রাঁড়ের সম্পত্তি সরকারে বর্তায়। কিন্তু চাঁদ তার ঘর বাড়ি সবই সিদ্দিঠাকুরের নামে আগেই বিক্কির কোবালা লিখে দিয়েছে। মন ভোলাবাবার গুনে তো ঠাকুরের ঘাট

নেই। চাঁদ মরার পরে সে সব খোঁজ পড়ল। জানাজানি হতেই সিংজী-বাবুর মেজাজ খারাপ। বড়লোক মানুষ, পাড়ায় তার জোর বেশি। আমাদের মড়া আর কে ছোঁবে? পাড়ার আর দশটা ছেলে ছাড়া গতি নেই। কিন্তু সিংজী সাহেব টাকা দিয়ে সকলের হাত বেঁধে দিলে। কেউ আর চাঁদের মড়া বইতে চায় না। কী বিপদের কথা বাবা, বল দিকিনি?'

হ্যাঁ, বিপদ, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপত্তারণের জবাবটাও যেন এখন আমার কাছে অনেকখানি পরিষ্কার। তবু, কথা না বলে, শ্রোতার ভূমিকায় জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলাম সন্ধেতারার দিকে। তার ভ্রূকুটি বিরক্ত চোখের দৃষ্টি তখন ঠাকুরমহাশয়ের দিকে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। রাজ্যের বিস্ময় তার স্বরে আর চোখে মুখে। 'তা ওই ঠাকুর মিনসে কী করলে জান বাবা? চাঁদের গতি করতে, আমাদের পায়ে ধরে সাধতে এল। বোঝ একবার কাণ্ড! এমন কথা কেউ কখনো শুনেচে, মেয়েরা মড়া বই করবে? কিন্তু সিদ্দিঠাকুর কান্নাকাটি শুরু করলে। শাস্তরের কথা আমরা জানি নে, সে আমাদের অনেক করে বোঝালে। সেই রামায়ণ না মহাভারতের আমলে মেয়েরাও নাকি মড়া বইতো। এদিকে বিকেলের মড়া, রাত পোয়াতে চলেচে। আমরাও গিয়ে পাড়ার ঘরে ঘরে ছেলে ছোঁড়াদের অনেক ডাকা সাধা করলাম। কেউ বেরতে চাইলে না। উল্‌টে মেয়ে মদ্দ সবাই মিলে অনেক কথা শুনিয়ে দিলে। যাবেও না, আবার আনুমান্‌ কথা। তা আমরাও ঠিক করলাম, যা থাকে কপালে, চাঁদের মড়া আমরাই বইব। আমাদের দিন গেচে। কে আর কী বলবে? শত হলেও চাঁদ আমাদের বন্ধু ছিল।'

লক্ষ্মীমণি বললো, 'ও কথাটিও বল, ঠাকুর একটা পয়সাও বার করেনি। খরচ-পত্তর যা এখনও সবই আমরা করচি।'

কেন, সেই কথাটা জিজ্ঞেস করতে গলায় আটকাচ্ছে। চাঁদ বন্ধু, কেবল সেই কারণেই? তাও নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করে? আমি ঠাকুর-মহাশয়ের দিকে তাকালাম। তার লম্বা-চওড়া শক্ত সমর্থ গোরা চেহারা আগেই দেখেছি। চুলেও তেমন পাক ধরেনি, দাঁত সব অটুট। মুখে বয়সের ছাপটা একেবারে লোপাট হয়নি। সেটা বার্ধক্যের ভাঙাচোরা খানাখন্দে ভরা না। নাম কি সিদ্ধেশ্বর। তারপরেও রমণীমোহন না বলি, গণিকা-মোহন বলতে বাধা কী? অন্যথায় এমন অসাধ্য সাধন করলো কেমন করে। এই বাহিকাদের বশ মানাবার মন্ত্র তার জানা আছে। সে মন্ত্রের ধান্দা করা অসম্ভব। এমন মানুষ কোন ধাতু দিয়ে গড়া, জানি না। তবু মনে মনে বলতে হলো, নমস্কার মহাশয়। খবরের কাগজের দুর্ভাগ্য, এমন একটি শ্মশানযাত্রার ছবি দেশবাসী দেখতে পেলো না। আপনার অভিনব কীর্তি-কাহিনীও জানতে পারল্লো না।

তবু একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না। 'কিন্তু এখানে এসে তো দেখলাম, আপনাদের লোকেরা সবাই আগে থেকেই জানতো।'

'তা জানতো।' সন্ধেতারা বললো, 'খবর তো চাপা থাকে না। আর এখেনে সিংজীর জারিজুরি খাটে না। এখন আমরা নিশ্চিন্দি। তবে হ্যাঁ, আমাদের তল্লাটে এ নিয়ে এবার একটা তোলঘোল কাণ্ড হবে। এখনই বলে রাখচি, দেখো।'

না, সে তোলঘোল কাণ্ড দেখবার সময় আমার কোনোদিন হবে না। চালিতে কাঁধ দিয়েছি, রমণীদের শব বহন দেখেছি, এই কথাটা মনে থাকবে। তারপরেও দেখছি, এই স্মৃতিটা আজ অনেকখানি তুচ্ছ হয়ে এসেছে। কিন্তু সংসারের নিরন্তরতায় কতো ঘটনা ঘটে চলেছে, তাব কতোটুকুই বা জানতে পারি। তার লীলার অন্ত নেই।

আমার খেলা সাঙ্গ। এবার উঠতে হয়। এমদাদের মুখটা মনে পড়ছে। এখন বুঝতে পারছি, শববাহিকাদের পিছনে পিছনে, যে ধুলিঝাড়াগুলো আসছিল, সে খবর পেয়েছিল তাদের কাছেই। কিন্তু আমাকে সাবধান করার সময় পায়নি। এখান থেকে ফিরে গিয়ে যে আর তার দেখা পাবো, সে-ভরসা নেই।

ইতিমধ্যে দেখছি, রুকি আর লতা এসে হাজির। হাতে তাদের দাহকর্মের নানা সম্ভার। শুধু দুজন না, আরও দুজন আছে। তাদের দেখে থাকলেও মনে নেই। রুকি তার শাড়ি জামা বদলায় নি। লতাও না। তবে এখন তার ভেজা চুল মোছা। কিন্তু আঁচড়ানো না। শাড়ির ভিতর জামা পরে এসেছে। দেখছি, সকলের নজরই এদিকে। খেটো বেজিদের বয়সী আর এক যুবকও এসেছে। লুঙ্গির মতো করে ধুতি জড়ানো। গায়ে একটা পাতলা জামা। নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা হচ্ছে। আমি ওঠবার উদ্যোগ করলাম। রুকি হাত তুলে ডাকলো, 'সন্ধেমাসী, একবার এদিকে এস।'

সন্ধেতারা উঠলো। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। চারুবালা পিছন ডাকলো, 'একটু বসে যাও বাবা।'

'না, আর বসবো না। এবার আপনাদের কাজ আপনারা করুন। আমি একটু ঘাটে যাই।' উঁচু ঢিবির গাছের তলা থেকে নেমে এলাম। তার মধ্যেই দেখতে পেলাম, খেটো আর বেজি ছাড়া, নতুন যে যুবকটি এসেছে, সে হঠাৎ দৌড়ে চলে গেল শ্মশানঘাটের বাইরে। বাঁধানো ঘাটের উঁচু পথে। আমি কাছাকাছি হতে, ঠাকুরমহাশয় এগিয়ে এসে বললো, 'তোমাকে আর এখেনে বসিয়ে রাখব না বাবা। তুমি নেয়ে ধুয়ে একটু সাফ সুরত হয়ে নাও। কিন্তু চলে যেও না।'

শ্মশান বলে কথা। এ যে দেখছি এখন যমে ছাড়ে না। কিন্তু হেসেই

বললাম, 'আমাকে আর আটকাচ্ছেন কেন? স্নানটা করবার ইচ্ছে আছে, তবে জামাকাপড় শুকোবার উপায় নেই। ভাবছি, ভেজা জামাকাপড় নিয়েই আমি চলে যেতে পারবো।'

'নবদ্বীপে যাবেন তো?' রুকি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তা যাবেন। জামাকাপড় শুকোবার ব্যবস্থা সব হবে। সেজন্যে ভাবতে হবে না। কিন্তু একেবারে এরকম করে কেন যাবেন?'

তবে কি আমি এদের সঙ্গে শ্মশানে থাকবো নাকি? মনটা ক্রমে বিরূপ হয়ে উঠলো। সেটা জানাতে পারি না। বললাম, 'আমাকে আর কী দরকার? কিছু করার আছে কী?'

'না, তা নেই।' এবার লতা এগিয়ে এলো রুকির পাশে। 'আমাদেরও একটা ধমমো কমমো আছে তো। আপনি এভাবে চলে গেলে, আমাদের মন খারাপ করবে।'

ঠাকুরমহাশয় বলে উঠলো, 'বুঝলে না বাবা, এরা তোমাকে একটু সেবা করতে চায়।'

সেবার গাওনা তো সে সাঁকো পেরিয়ে পাড়ার ধারে দাঁড়িয়েই গেয়েছিল। এখন কি আমাকে সেই পাড়ায় গিয়ে, রুকি লতার সেবা নিতে হবে নাকি? শুনেছি, চালকোটার ঢেঁকিকেই বোঝানো যায় না। কারণ লাথির ঢেঁকি চাপড়ে ওঠে না। আমি বললাম, 'না, আমার কোনো সেবার দরকার নেই। মাফ করবেন, আমি একটু ঘাটে যাচ্ছি।'

পা বাড়াতেই লতা ডাকলো, 'শুনুন দাদা, আমাদের ঘরে গিয়ে আপনাকে বসতে হবে না। কী করেই বা তা বলি বলুন, আমরা কি আর বুঝিনে?' সে রুকির দিকে তাকিয়ে হাসলো।

রুকিও হাসলো। অভাবিত কী না জানি না, রঙ্গিনীর হাসি না। লতার রূপে একটা পরিচ্ছন্নতা ছিল। রুকিও তেমন অপরিচ্ছন্ন না। তবু তার শরীরের স্বাস্থ্যের ঔদ্ধত্যে, চোখে-মুখে জীবনযাপনের ছাপটা একেবারে চাপা দেওয়া যায়নি। লতাকে সেই হিসাবে নম্র লাবণ্যময়ী বলতে হয়। তা হলেও, গলা বাড়িয়ে বলবো না, বেমানান। এমনটিও দেখা যায়। আবার সমাজের বুকেও দেখা যায় অনেক কিছু বেমানান। স্থান কাল বিশেষে গৃহস্থ-অ-গৃহস্থ-রূপে ভাগাভাগি করা যায় না। স্বীকার করতে হবে, তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে না, সমাজের পিছন দরজার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। বরং গৃহস্থের সদরের ছবিই যেন স্পষ্ট। তবু আমি যা, তা-ই। কানা, মনে মনে জানা।

রুকি বললো, 'সে ভয় করবেন না। আপনি নেয়ে ধুয়ে একটু ধাতস্থ হন। আপনাকে ইদিকে আর আসতে হবে না। বাঁধা ঘাটে বসে একটু রোদ পোয়ান। আপনার মনের মতন সর্ব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

কথা বইছে কোন ধারায়, কিছু বুঝতে পারছি না। এরা যে তাদের ঘরে

আমাকে যেতে বলবে না, তা আমি জানি। সে-আশংকা আমি একবারও করিনি। দেহোপজীবিনী হলেও, কথাবার্তায় তাদের সহজ বোধবুদ্ধির ধারটা মোটামুটি বোঝা গিয়েছে। কিন্তু সেবাটা কিসের? আমার মনের মতো ব্যবস্থাই বা কী হয়ে যাবে।

'ওরা ঠিকই বলেচে বাবা তোমার কোন অসুবিধে হবে না।' সন্ধেতারা রুকি লতাকে দেখিয়ে বললো, 'আমাদের এই দু মেয়ের সব দিকে নজর আছে। আমরাই বরং ভাবচিলাম, কী করে কী হবে।'

দুর্গাদেবী চালি ছুঁয়ে বসেই ছিল। বললো, 'কথাটা আমার মনেই আগে এসেছিল, ঠাকুরকে আমিই আগে বলেচি।'

'তা বলেচ সত্যি।' সন্ধেতারা বললো, 'সন্ধান তো এ মেয়েরা ছাড়া কেউ জানে না। তা সে যাই হোক গে, বংকা যখন গেচে, ব্যবস্থা হবেই। মেয়েরা যা বলচে, তুমি তাই কর বাবা। নাওয়া ধোয়া সেরে নাও গে।'

ঠাকুরমহাশয় একটু ব্যস্ত, তাড়া দিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। এবার আমরা এদিকটা দেখি। তুমি বাবা চানটান করে তোয়ের হয়ে নাও।'

ইতিমধ্যে খড়কুটো মুখ শাদা ছাঁটা চুল বুধাকে, ঘৃত লেপন, নববস্ত্র জড়ানো ইত্যাদি চলেছে। অনেক্ষণ থেকেই, হারমোনিয়ামে বেশ পাকা হাতের বাজনা ভেসে আসছিল। কোথা থেকে আসছিল, জানি না। তার সঙ্গে বাজছে কেবল মন্দিরা। ডুগি তবলার সঙ্গত নেই। বাজনার সঙ্গে কোনো স্বরের গানও শোনা যাচ্ছে না। কেবল হারমোনিয়ামে বেজে চলেছে পরিচ্ছন্ন পাকা হাতের বাজনা। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, ভৈরোঁ সুরে টপ্পার অঙ্গে শ্যামাসঙ্গীত বাজছে। মাঝে মাঝে ধন্দ লেগে যাচ্ছে। চেনা চেনা মনে হলেও, ঠিক যেন বিশেষ কোনো শ্যামাসঙ্গীত বাজছে না। তবে সুরটা খেলছে ভৈরোঁ রাগে। দানার কাজ এত স্পষ্ট, বাজনদারের আঙুলে জাদু আছে। হঠাৎ শুনলে মনে হতে পারে, কোনো স্ত্রী-কণ্ঠে, নিমগ্ন প্রাণের নিবিড় গলার স্বর ভেসে আসছে। মন্দিরার ঠিন ঠিন মিলেছে ভালো। ডুগি তবলার বৈঠকি আমেজটা নেই বলেই যেন ভালো লাগছে বেশি।

কিন্তু পাকা হাতের মিঠে বাজনা যেখান থেকেই ভেসে আসুক, কান পেতে শোনার সময় নেই। এরা কিসের ব্যবস্থা কিসের সন্ধান করছে, আমার এই এক জন্মে বোধহয় ভেবে ওঠা সম্ভব না। বংকাই বা ছুটে গেল কোথায়? ভাবতে পারতাম, তোমরা যা খুশি তাই করো। আমি যাই আমার পথে। কিন্তু হালচাল দেখে নির্ঘাৎ বুঝতে পারছি, পা বাড়ালেই পথ পাওয়া যায় না। পাল্লায় পড়েছি। ওজনের পাল্লা না। এ পাল্লার নাম, পালে পড়েছি।

হাসির শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি, রুকি আর লতা দুজনে নিজেদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। রুকি বললো, 'তুই বল, আমি তো বললাম।'

'আমিও তো বললাম।' লতা তাকালো আমার দিকে, 'যান আপনি ঘাটে যান। তারপরে আমাদের ব্যবস্থায় আপনার মন বসে তো থাকবেন। নইলে যা প্রাণ চায় করবেন। এর ওপর তো কথা নেই?' সে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো রুকির দিকে।

রুকি বললো, 'তুই আবার অমন করে বলচিস কেন। প্রাণ ঠিকই চাইবে।'

'ও মা, কী বলচিস তুই?' লতার কালো চোখে অবাক ভ্রূকুটি, 'আমি কি দাদাকে চলে যেতে বলচি নাকি? মানুষের মুখ দেখে বুঝি নে? যেন কী বিপাকে পড়ে গেচে। কিন্তু জোর খাটাবো কী দিয়ে, বল?' সে আমার দিকে এই প্রথম চোখের কোণে তাকালো।

রুকির চোখে কি চকিতে একটু ইশারার ঝিলিক হেনে গেল? বললো, 'কী দিয়ে আবার? আমরা কি মানুষ নই? মানুষের মন নেই আমাদের? ভালকে ভালর জোর খাটিয়ে রাখব। আমরা কি বাবু বসাতে যাচ্ছি?'

লতা আমার দিকে তাকিয়েছিল। তাড়াতাড়ি চোখ নামালো। মুখে তার লজ্জার ছটা। বারোবিলাসিনীও রমণী, লজ্জা তারও ভূষণ। বললো, 'ছি, তাই কি আমি বলছি?'

রুকির অনায়াস জিজ্ঞাসু উক্তিটি কানে বিঁধলো, মোচড়ও দিল। তবু উদাস মুখে, অবুঝ চোখে তাকিয়ে রইলাম। সব কথা বুঝতে নেই।

'তা বলিসনি, বাবা ভালই জানে।' সন্ধেতারা হেসে তাকালো আমার দিকে, 'তোমার ভাববার কিছু নেই। আর বেলা বাড়িও না, নেয়ে ধুয়ে নাও গে।'

মনে যতোই ধন্দ থাক, স্বীকার করতে হবে, সন্ধেতারার কথায় কেমন ভরসা আর স্বস্তি যোগায়। রুকি বা লতাকে নিয়ে আমার অবিশ্বাস নেই। কিন্তু এ দুই গাঙ গহীন না হতে পারে। তেজী আর বাঁকা স্রোতের টান গতিক বোঝা যায় না। আমি আর কথা না বাড়িয়ে, বাঁধানো বড় ঘাটের দিকে পা বাড়ালাম। ঘাড়ের চালি নেমেছে বটে। তাকে যদি জোর জুলুমের মত্ততা বলি, তবে খোয়ারি কাটাতে হবে। এখন, সেই খোয়ারি কাটাবার ব্যবস্থা, কোন বেড়িতে কী ঘোরে কাটবে, তা জানি না। জানবার উপায়ও নেই।

পিছনে রুকির গলায় শুনতে পেলাম, 'হাঁ করে এখানে দাঁড়িয়ে রইলে যে? সঙ্গে যাও।'

'যাচ্ছি রে বাবা। মাসী যেন কী বলছিলে?' বেজির গলা।

কোন মাসী কী বললো, তা আর আমার কানে এলো না। আমি ঘাটের ওপরে এসে দাঁড়ালাম। পিছনে গাছপালা দোকানঘরের মাথা ছাড়িয়ে, মাঘের ছায়া লম্বা হতে আরম্ভ করেছে। রোদ এখন ঘাটের নিচের দিকে। কয়েক ধাপ

নামলে, ডাইনের মন্দিরে গৌর নিতাই। মনে করতে পারছি না, বিষ্ণুপ্রিয়াও বিরাজ করছিলেন কী না। বাঁয়েও মন্দির, বিগ্রহকে দেখতে পাচ্ছি না। জলে এখনও কেউ কেউ স্নান করছে। একদল কুচো কাঁচা বোধহয় সবখানেই, জল পেলে, হাত পা দাপিয়ে ঝাঁপাই জোড়ে। ওদের বেলা অবেলা নেই। শীতও নেই। তা ছাড়াও, ঘাটের সিঁড়ির এপাশে ওপাশে স্ত্রী পুরুষ কিছু বসে আছে। সবাই তারা তীর্থযাত্রীদের কাছে কিছু পাবার প্রত্যাশায় হাত বাড়িয়ে নেই। দুই চার বুদ্ধ-বুদ্ধাকে দেখছি, মালা জপছে। কেউ বসে আছে চুপচাপ। জপে নেই ধ্যানেও নেই। এমন কি মনে হচ্ছে না, নদী প্রকৃতির মহিমা অবলোকন করছে। ঢলে যাওয়া বেলায় রৌদ্র পোহায়, নাকি কেবল ঘাটের টানেই ঘাটে এসে বসেছে, বুঝতে পারি না। শুয়েও আছে দু' একজন।

দক্ষিণের ভাঙা ঘাটের ওপরেই গঙ্গাযাত্রীদের ঘর। ভাঙাচোরা ক্ষয়িষ্ণু ঘাট দেখে বোঝা যায়, ওটাই প্রাচীনতম। স্নানার্থীদের ভিড় নেই। গোটা কয়েক নৌকা দাঁড়িয়ে আছে, পুরনো ঘাটের গায়ে। গঙ্গাযাত্রীদের ঘরে গঙ্গাযাত্রী কেউ নেই, দেখেই বোঝা যায়। অন্তর্জলি দুরস্ত। এমন পুণ্যের আশা আর কারো নেই, গঙ্গায় অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে, বাকি অর্ধেক ডাঙায় রেখে তিলে-তিলে স্বর্গে যাবে। গঙ্গাযাত্রার ঘরগুলোতেও আজ আর আর সেই মুমূর্ষুরা নেই, যারা ঘর ছেড়ে ঘাটে এসে শেষ মুহূর্তের প্রহর গুনছে। সেই কারণেই গঙ্গাযাত্রীদের ঘরের আর এক নাম, 'মুমূর্ষুদের ঘর'। কালের বাতাস দিক বদল করেছে। পুণ্যের ওপর আস্থা থাকলেও, সহজ প্রাপ্তির রাস্তা ধরেছে সবাই। ঘরে শুয়ে সাঙ্গ কর ভবলীলা। কাঁধে চেপে চলে এসো একেবারে চিতার অঙ্গনে। গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিলেই শান্তি।

এখন যারা ঘরে নেই, পারেও নেই, বসে আছে ঘাটের কিনারায়, তারা গঙ্গাযাত্রীর ঘরে বসে কেউ ধুনো জ্বালাচ্ছে। ব্যোম ব্যোম আওয়াজ দিচ্ছে। তাস পেটাচ্ছে যারা, তারা হতে পারে মালবাহী নৌকার মাঝি। ভবঘুরে ভিখিরিদের সঙ্গে, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে কুকুর। পুরনো ঘাটের আর একটু দূরের দক্ষিণে, মুক্ত সরস্বতী পশ্চিমগামিনী। একটা নৌকা খেয়া পারাপার করছে। নদীর মাঝখানের চর থেকে এসে, ঘাটের ডান দিকে তার নোঙর।

এবার ভাবো, এই সেই কোনো এককালের বন্দর শহর। মুসলমান আমলের অনেক আগে থেকেই নাকি যার রমরমা। বিপ্রদাসের চোখে দেখা সমুদ্রগামী জাহাজের ভিড়। বিদেশী ভ্রাম্যমানদের চোখের বিস্ময়। মুঘল আমলের নগর। টোলে টোলে ছয়লাপ। সংস্কৃত শিক্ষার মস্ত কেন্দ্র। মুকুন্দরামের তো নাকি ত্রিবেণীর কোলাহলে কানে তালা লাগবারই অবস্থা হয়েছিল।

এই চিত্রেই ইতি না। পুণ্য এক সময়ে রক্তধারায় বহতা ছিল। মুক্ত

বেণীতে মাথা মুড়িয়ে, নারী পুরুষের প্রাণ বিসর্জন। নিদেন, এমনি জলে ডুবে মরতে না পারলে, নিজের গলা কেটে কুমিরের খাদ্য হবার ভাগ্যও নাকি অনেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কেন না, আসল যাত্রা ও ফললাভ যে স্বর্গ! তারপরে তুমি যতো খুশি বলো না কেন, 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহু দূর।' কেউ থাকে যুক্তিতে। মুক্তিতে কেউ। তর্ক বৃথা। বিশ্বাসেই মিলে বস্তু।

অতঃপরেও দক্ষিণের গঙ্গাযাত্রীদের পোড়ো ঘরের দিকে তাকিয়ে, সেই নরনারীদের কথা ভুলতে পারছি না। যারা নিদান গুনে, মৃত্যুর অমোঘ যাত্রায় এসে ঠাঁই নিয়েছিল মুমূর্ষু গৃহে। কিন্তু কী বিপদের কথা। নির্ঘাৎ মরণও হাত ফসকে যায়। যমরাজার পরিহাস আর কাকে বলে। ঘর থেকে ডেকে এনে শুইয়ে রাখলো মরণ শয্যায়। অথচ মরণের আর দেখা নেই। যমরাজা পলাতক। তখন উপায়? একবার গঙ্গাযাত্রা করে তো আর ঘরে ফিরে যাওয়া যায় না। গৃহের অকল্যাণ। একবার এলে, ঘরে ফিরে যাবার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ। ওদিকে বেপাত্তা যমের অরুচি শরীরে নতুন প্রাণের লক্ষণ। এর নামই কি যমের অরুচি? ভাঁটায় এসে জোয়ারের ভরা। যাকে বলে মরা গাঙে জোয়ার। কিন্তু যাবে কোথায়?

কেন, ওপারের শান্তিপুরে? সত্যি মিথ্যা জানি না। ঘাটে এসেও মৃত্যু যাদের ফাঁকি দিতো তারাই নাকি শান্তিপুরে যেতো। আর তাদের নিয়েই শান্তিপুর পল্লীর পত্তন। আমার কথা না। কেতাবের কথন। আজব কাণ্ড ভেবে গালে হাত দেবো না। সেই নরনারীদের কথা ভাবছি। ঘরে যারা ফিরতে পারেনি, ঘাটে যাদের গতি হয়নি, পুনর্জীবনটাকে তারা কী মন নিয়ে শুরু করেছিল।

মুক্তবেণীর সে-জীবনরহস্য আর জানবার উপায় নেই।

আমি আরও কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামলাম। স্নান সাঁতার কাপড় কাচা যে-রকম চলছে বেশি নিচে নেমে কাঁধের ঝোলা নামানো যাবে না। কারণ নিচের সিঁড়ি ভেজা। হারমোনিয়ামের বাজনা আর মন্দিরার তাল এখন আরও স্পষ্ট। কোথায় বাজছে তাও দেখতে পেলাম। কারণ, নিচের দিকে সিঁড়ির চওড়া পৈঠায় ভিড় করেছে একদল শ্রোতা। তাদের দেখেই নৌকাটি চোখে পড়ল। ঘাট থেকে কয়েক হাত দূরে একটি নৌকা নোঙর করে রয়েছে। খুব ছোটখাটো নৌকা না। বেশ বড় নৌকা। মাথার ওপর ছই কাপড় দিয়ে মোড়া। পালের মাস্তুল বেশ উঁচু। মাস্তুলের পাশেই আর একটি সরু বাঁশের দণ্ড। তার ডগায় উড়ছে লাল নিশান। লাল ত্রিকোণ নিশান। ধর্মের ধ্বজা, সন্দেহ নেই।

ছইয়ের বাইরে চওড়া পাটাতনের ওপর বিছানা পাতা। বিছানাই বলতে

হবে। ঘাটের ছোঁয়া বাঁচিয়ে একটু দূরে হলেও বোঝা যায়, তোশকের ওপর গেরুয়া চাদর পাতা। এলোমেলো খান কয়েক বালিশ ছড়ানো, কম্বল রয়েছে একাধিক। ঢলে যাওয়া বেলার রোদ সেখানে। শয্যা দেখে, নৌকার অধিবাসীদের জাঁকজমক কিছুটা বোঝা যায়।

ঘাটের দিকে মুখ করে বিছানায় বসে যিনি হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন গায়ে তাঁর গেরুয়া চাদর। কোলের ওপর থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা ঝালর দেওয়া মসৃণ কম্বল। মাথার ধূসর রঙের বড় বড় চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। জট পড়েনি। বোধহয় স্নানের পরে আঁচড়ানো হয়নি। ধূসর গোঁফদাড়ি মুখে। খড়্গনাসা না হলেও উচ্চনাসা বটে। চোখ দুটি টানা। বসে থাকলেও, শক্ত সমর্থ শরীর যে বেশ দীর্ঘ, অনুমান করা যায়। বয়স অনুমান করা কঠিন। মুখে তেমন রেখা ভাঁজ নেই। হাসি আছে। বাজাচ্ছেন তন্ময় হয়ে, কিন্তু খোলা চোখে তাকাচ্ছেন এদিকে ওদিকে। মাঝে মাঝে ভুরু নাচাচ্ছেন। চোখের তারা ঘোরাচ্ছেন। আর মন্দিরার তালে তালে একটু আধটু ঘাড় ঝাঁকাচ্ছেন। কপালে একটা লাল ফোঁটা। বাঁ হাতে লোহার বালা।

পাশে বসে মন্দিরা বাজাচ্ছে একটি নিরীহ গেরুয়াধারী। বয়স কম। মাথার চুল কালো ঘাড় পর্যন্ত ছড়ানো। মুখে গোঁফদাড়ি নেই। শরীরটি হৃষ্টপুষ্ট। কপালে লাল ফোঁটা আর হাতে লোহার বালাও আছে।

গেরুয়া এমন রঙ ধর্মের মত পথের ঠিকানা করা দায়। নিছক গেরুয়া বলাও মুশকিল। একটু যেন বা গাঢ়। কিন্তু নিশানের মতো লাল না। রক্তাম্বর হলে মহাশয়দের শাক্ত ভাবা যেতো। শাক্ত কী না, তা-ই বা কে বলতে পারে। লাল নিশানটা একটু ধন্দোর কারণ। দশনামী সম্প্রদায়ের সব আখড়াতেই ওরকম পতাকা দেখা যায়। এঁরা সেই সম্প্রদায়ের কী না, তা বোঝার উপায় নেই। শৈব হতে পারেন। বৈষ্ণব হতেও বাধা ছিল না। কিন্তু বৈষ্ণবের কপালে লাল ফোঁটা কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

শাক্ত হোন, শৈব হোন এঁদের অঙ্গ জুড়ে সাধক পরিচয়। বাঙালী না অবাঙালী, বোঝবার উপায় নেই। বাজনায় ভাষা বোঝা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই সন্ধান পাচ্ছি না। ছইয়ের মুখছাটের কাছে রীতিমতো দরজা বসানো। তার শিকল আছে, জোড়া কড়া আছে। নিশ্চয় ভিতর থেকেও বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে। সামনের দিকে এই চিত্র। এখন জোয়ার চলছে। নৌকার পিছন দিক উত্তরে। সেদিকে পাটাতনের ওপর কাঁথা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কয়েকজন। কতো জন তা বোঝাবার উপায় নেই। সম্ভবত তারা মাঝি। শুয়েছে গলুই ঘেঁষে। আরও অনেকখানি জায়গা খোলা। সেই খোলা জায়গায় রয়েছে কিছু পিতল কাঁসার নানা পাত্র। আর একজন দাঁড়িয়ে আছে উত্তরে পিছন ফিরে ছইয়ের গায়ে পিঠ দিয়ে।

ঐ আর একজনেই, বাজনার থেকে ঠেক বেশি। সে পিছন ফিরে আছে বটে। কিন্তু উত্তরের অল্প বাতাসে, তার নীল শাড়ির আঁচল উড়ছে। খোলা চুল পিঠে ছড়ানো। কোমরের শাড়ির বন্ধনী আর লাল জামার ফাঁকে, পিঠের একটু ফরসা ফালি উঁকি দিচ্ছে। একটি হাত ছইয়ের ওপরে। আর একটি হাত সামনে, আমার চোখের আড়ালে। মুখ দেখতে পাচ্ছি না। ছইয়ের ওপর রাখা ফরসা নিটোল হাত আর ডানা। হাতে একটি লোহার বালা। গেরুয়া বা লাল, যাই হোক, এমন বস্ত্রাবৃত সাধকদের সঙ্গে, রমণীর অঙ্গে নীল শাড়ি লাল জামা কেন। সাধুর সঙ্গে গৃহস্থ রমণী। পরিচয় কি, পরিচারিকা ? শাড়ি জামা দেখে ঠিক তেমনটি মনে হয় না। তা ছাড়া, শাড়ি পরার ধরনটা আদৌ আটপৌরে না। পিছন থেকে হলেও, বাঁ কাঁধে আঁচলের বহর আর ডান কাঁধের জামার গলার ছাটে কাটে, কেমন একটা আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে রয়েছে। উঁচু ছইয়ের ওপরে কাঁধ দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘ শরীর সন্দেহ নেই।

সব কিছুর ওপরে মুখ। তা যখন দেখতে পাচ্ছি না, তখন অনুমানে কাজ নেই। তবু সাধক সাধু যাই হোক, তাঁদের সঙ্গে এই রমণীকে পরিচারিকা ভাবতে পারছি না। সেবিকা ? হতে পারে। সেবিকাদের তো কোনো সাধিকা বেশের দরকার নেই। অন্তত এটাই ধারণা।

কিন্তু এতো কৌতূহলই বা কিসের। মুক্তবেণীর ঘাটের একটি ছবি। সাধক বাজান হারমোনিয়াম, মনোরম বাজনা। নৌকার সর্বাঙ্গেই বিলাসের শ্রী। আধুনিক ছাঁদে শাড়ি জামা পরা এক রমণী। বড় ছইয়ের ভেতরে আর কেউ আছে কী না, ছইয়ের মুখছাটের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না। নৌকায় এসেছেন যখন, নিশ্চয় দূরান্তরের যাত্রী। নোঙর তুলে যখন খুশি ভেসে যাবে। আমার কৌতূহল নৌকার পিছু ধাওয়া করবে না। মুক্তবেণীর একটা ছবি, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। অতএব, জামা কাপড় খুলে এবার জলে নামি।

কাঁধের থেকে ঝোলাটা নামিয়েই, থমকে যেতে হলো। ঝোলা তো নামাচ্ছি। কব্জির ঘড়ি খুলতে হবে। পকেটে পাথেয় বলতে, যা হোক কিছু কিঞ্চিৎ আছে। মুখের কথায় তো এ সংসার রা কাড়ে না। এখনই আমার মহাপ্রাণী ক্ষুধায় কাতর। অন্তত সেই কারণেও, পাথেয় বস্তুটি অমূল্য সম্পদ। সিগারেট দেশলাইয়ের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। সব ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে জলে নামবো কোন ভরসায়। তা ছাড়া ঝোলার মধ্যেও রয়েছে দু' একখানি বদলাবার পোশাক ছাড়া নিত্য ব্যবহারের টুকিটাকি বস্তু।

থমকে যেতে চোখ পড়লো নৌকার সাধক-বাজনদারের দিকে। সেখানে আমার সংকটের মোচন মুক্তি ছিল না। কিন্তু ধূসর চুলে আর গোঁফদাড়িতে ঝাঁকুনি দিয়ে হাসলেন। চোখের তারা ঘুরিয়ে ভুরু নাচালেন। অবাক হলাম। কেননা, তাঁর টানা চোখের ভাবের দৃষ্টি যেন আমার দিকেই। কিংবা

ভুল দেখছি। আবার মন্দিরা-বাদকের দিকে তাকিয়ে যেন কিছু ইশারা করলেন। সেই বাবাজীও আমার দিকে হেসে তাকালেন।

'রাখুন, এখানেই সব রাখুন।' পিছনেই গলার স্বর শোনা গেল, 'আমি আছি।'

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, বেজি দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট টানছে। হেসে আবার বললো, 'আমি তো সেই জন্যই এলাম, আপনার ব্যাগ পাহারা দেবার জন্যে। এখেনে কোন শালাকে বিশ্বাস নেই।'

এখন মনে পড়লো, রুকি তাকে 'সঙ্গে যাও' বলেছিল। শক্ত শরীর, বুক খোলা একটা জামার নিচে লুঙ্গি পরা বেজি। মাথার চুল রুক্ষ। চোখের কোল বসা। ও কোন পাড়া থেকে এসেছে, দেখেছি। রুকিদের পাড়ার লোক। সম্পর্কটা কী জানি না। ধরে নিতে পারি, রুকিদের লোক। সেটাই স্বস্তি আর সান্ত্বনা। বিশ্বাস করা না করার প্রশ্ন ওঠে না। এখন বিশ্বাস করাটাই একমাত্র উপায়।

আমি হাতের ঘড়ি খুললেই বেজি হাত বাড়িয়ে দিল, 'দিন, আমার কাছে দিন।

দিয়ে দিলাম। কেবল হাতের ঘড়ি না। পকেটে যা ছিল, সবই তার হাতে তুলে দিলাম। সে সবই নিজের জামার পকেটে ঢুকিয়ে নিল। গায়ের শালটাও নিল হাত বাড়িয়ে। বললো, 'বলে দিয়েছে, আপনি জামা কাপড় ভিজিয়ে চান করবেন। শুকোবার ব্যবস্থা আছে।'

'কোথায় শুকোবো ? এই ঘাটে ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বেজি হেসে বললো, 'না না, জায়গা আছে। আপনি ডুব দিয়ে আসুন না।'

ব্যবস্থার কথা আগেই শুনেছি। এখন জায়গার কথাও শুনছি। কিন্তু ওসব নিয়ে আর ভাববো না। জামা গেঞ্জি খুলে, কাপড় গুটিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামলাম। আবার চোখ পড়লো সাধক বাজনদারের দিকে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। ঘাড় ঝাঁকাচ্ছেন। বাঁ দিকের ঘাটের পৈঠায় বসা শ্রোতার দল, মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে দেখলো। বোঝা গেল, সাধক-মহাশয় আমার দিকেই তাকিয়েছিলেন। ঘাড় ঝাঁকানির সংকেতটা বোঝা দায়। নজরই বা কেন ?

জলের তলে দুই সিঁড়ি নেমে, আগে জামা গেঞ্জি চুবিয়ে নিলাম। কাচবার কোনো ব্যাপার নেই। কোনোরকমে নিঙড়ে, ছুঁড়ে দিলাম শুকনো সিঁড়ির ওপরে। বেজির স্বর ভেসে এলো, 'ঠিক আছে। এবার ডুব দিয়ে উঠে আসুন।।'

আরও কয়েক ধাপ নেমে জলে ডুব দিলাম। ডুবের আগে শীতের প্রথম শিহরণটা গায়ে একবার সিরসিরিয়ে উঠেছিল। ডুব দিয়ে ওঠার পরেই,

শরীরটা জুড়িয়ে গেল। থামাতে পারলাম না। পর পর কয়েকটা ডুব দিয়ে, গভীর আরামে বুক চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। পরনের ধুতি দিয়েই গায়ে কিঞ্চিৎ বুলিয়ে নিলাম। তার মধ্যেই সাধক বাজনদারের দিকে একবার চোখ পড়লো। এখন আরও কাছাকাছি। হাত বাড়িয়ে দুবার চাড় দিলেই, সাঁতরে গিয়ে নৌকা ধরা যায়। সাধক হঠাৎ বাঁ হাত তুলে হাসলেন। চোখের তারা ঘুরে গেল। তাল পড়লো সমে। ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিলেন।

এমন বাজানোকে কেবল বাজানো বলে না। সবই দেখছেন, তালে আছেন। আসলে সুরের গভীরে যেন ডুবে আছেন। আমি কোঁচার কাপড় খুলে, সিঁড়িতে উঠে, জামা গেঞ্জি তুলে নিলাম। ওপরে এসে দেখি বেজি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি কোঁচার কাপড় দিয়ে গা মাথা মুছে, ঝোলার ভিতর থেকে বের করলাম অবশিষ্ট আর এক প্রস্থ জামাকাপড়। বড় গামছাটাও টেনে বের করলাম। কে আর দেখছে। গামছা জড়িয়ে আগে ভেজা ধুতি ছাড়লাম। দ্রুতহাতে পরে নিলাম ধোয়া শুকনো জামাকাপড়। বেজি শালটা বাড়িয়ে দিলে, 'নিন, এটাও আগে জড়িয়ে নিন।'

হ্যাঁ, শীতটা একেবারে গা ছাড়া হতে চাইছে না। ঢলে-পড়া বেলার রোদে আদৌ ঝাঁজ নেই। শালটা জড়িয়ে নিয়ে, ঝোলার মধ্যে হাত ঢোকালাম। হাতড়ে বের করলাম করলাম চিরুনি। কোনরকমে আধভেজা মাথার চুল একটু সাব্যস্ত করে নেওয়া গেল। বেজি সব ধাতে হাত তুলে দিল। ঘড়ি, পয়সাকড়ি, সিগারেট দেশলাই। ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে, ভেজা জামাকাপড়-গুলো তুলতে যাবো। তার আগেই, কয়েক ধাপ ওপর থেকে অন্য স্বরে শোনা গেল, 'থাক, ওগুলো আর আপনাকে নিতে হবে না, বেজিই নেবে।'

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি বংকা। তার পাশে লম্বা রোগা কালো চুল আছে। সেই ভরতি টাক না বলে, বলা উচিত, সারা মাথায় কিছু গোনাগুনতি কালো চুল আছে। সেই চুলের মাঝখানে একটি সিঁথির আভাস। গোঁফদাড়ি কামানো লম্বা মুখ, সরু চিবুক ঝুলে পড়েছে প্রায় গলা ছাড়িয়ে। পাতলা ঠোঁট দুটি টেপা। গালে লম্বা ভাঁজ। মুখের সঙ্গে মানানসই লম্বা নাকের পাটা আর ছিদ্রদ্বয় বেশ মোটা আর বড়। ভুরু জোড়ায় চুল প্রায় নেই। চোখ দুটি বেশ বড়। কিন্তু আপাতত চোখের পাতা কোঁচকানো। দৃষ্টিতে বিরক্তি বা রাগ ঠিক বুঝতে পারছি না। অথবা তীক্ষ্ন অনুসন্ধিৎসা আর সন্দেহের দৃষ্টি আমার দিকেই। কপালে সাদা ফোঁটা। গায়ে একটা ছাই রঙের চাদর জড়ানো। পরনে পাড়হীন গরদের ধুতিটি পুরনো বিবর্ণ। ক'পুরুষের ব্যবহৃত, সে-হিসাব সম্ভব না। তবে গরদ বলে এখনও চেনা যায়। কৃষ্ণকান্ত মহাশয়ের কৃষ্ণ পদযুগল খালি। বয়স অনুমান, অনধিক ষাট।

কিন্তু বংকার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আমার দিকে ঐরকম চোখে তাকিয়ে দেখছেন কেন। একমাত্র অপরাধীর দিকেই লোকে ঐরকম করে তাকায়। বেজি

নিচু হয়ে আমার ভেজা জামাকাপড় তুলতে যাচ্ছিল। তার আগেই, কৃষ্ণকান্ত মহাশয়ের মোটা কাঁসরের তীক্ষ্ন স্বর যেন ঝাঁজিয়ে উঠলো, 'থাক, থাক, তুই আর ওসবে হাত দিসনে।'

বেজি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওপরে তাকালো। কৃষ্ণকান্ত মহাশয় বংকাকে কিছু বললেন। বংকা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বেজিকে ডাকলো, 'তুই আর কিছু ছুঁসনে, চলে আয়।'

'শালা বামুনাদের পিটপিটানি দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।' বেজি নিচু স্বরে বললো, 'তায় আবার ছুঁচিবেয়ে গোরা চক্কোত্তিকে ডেকে এনেছে। যা খুশি কর গে শালারা।' সে আমার কাছ থেকে সরে গেল।

আমি বেজির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'গোরা চক্কোত্তি কে?'

'ঐ যে শালা, বংকার সঙ্গে এসেছে।' বেজি নিচু স্বরেই বললো।

গোরা চক্কোত্তি! তার মানে গোরাচাঁদ, নাকি গৌরাঙ্গসুন্দর? আর আমি কী না অবলীলায় কৃষ্ণকান্ত ভাবছি। রূপের ভেদে নাম, কোনোকালেই দেখতে পারিনি। চোখের মাথা খাই। বালাই বালাই। কৃষ্ণে আর খ্রীষ্টে কিছু তফাত নাইরে ভাই। যেঁহ গোরা, তেঁহ কৃষ্ণ। মনে মনে এইরূপ ভাবো। তা হলেই চক্ষু মনের বিপদ ভঞ্জন হয়ে যাবে। কিন্তু জানা নেই, চেনা নেই, গোরা চক্কোত্তিমশাইয়ের আমার প্রতি এমন রুষ্ট সন্দিগ্ধ দৃষ্টি কেন।

গোরা চক্কোত্তি ধাপে ধাপে নেমে এলেন। এসে দাঁড়ালেন আমার এক ধাপ ওপরে। আমার ভেজা জামাকাপড়গুলোর দিকে দেখলেন। যেন নর্দমার ময়লা দেখছেন। তারপরে সন্দিগ্ধ কঠিন দৃষ্টি রাখলেন আমার মুখের দিকে। মোটা কাঁসরের স্বরে ধ্বনিত জিজ্ঞাসা 'নাম কী?'

ঠোঁটের কূলে আমার পাল্টা জিজ্ঞাসা, 'আপনার প্রয়োজন?' কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। অথচ কৃষ্ণকান্ত—খুড়ি, গোরা চক্কোত্তিমশায়ের স্বরে কেমন একটা হুকুমের দাপট। অবেলায় স্নান করে, শরীর মনে একটা স্ফূর্তি বোধ করছি। অকারণ ভেজালে তা নষ্ট করতে চাই না। নাম বললাম।

শুনেই চক্কোত্তিমশাইয়ের গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। পাতলা ঠোঁট-জোড়া ছুঁচলো হয়ে, কঠিন মুখে ধিক্কারের বিকৃতি ফুটলো। লোমহীন ভ্রূকুটি চোখে দুর্বাসার ক্রোধ। প্রথমেই উচ্চারণ করলেন, 'কায়েত?' তারপরেই পিছন ফিরে হাঁক। 'বংকা, এই বংকা।'

'হ্যাঁ কাকাবাবু।' বংকা দুই লাফে অনেকগুলো সিঁড়ির ধাপ নেমে এলো।

গোরা চক্কোত্তির চোয়াল কাঁপছে। যেন শক্ত চিবুক চিবোচ্ছেন। বংকার দিকে ফিরে বললেন, 'তবে যে বললি, এ বামুনের ছেলে? এ তো কায়েত? তুই কি আমাকে খড়ুইপোড়া বামুন ভেবেছিস?'

বংকার চেহারা স্বাস্থ্য ভালো। চোখের কোলের কালিমা বাদ দিলে, মুখখানিও সুশ্রী বুদ্ধিদীপ্ত। বিব্রত হেসে বললো, 'বামুনের ছেলে বলিনি তো কাকাবাবু। বলেছিলাম, বামুনের ছেলে বলেই মনে হল।'

'মনে হলেই হল?' গোরা চক্কোত্তির মোটা কাঁসরে ঝাঁজর বাজলো, 'এখন একে নিয়ে আমি কী করব? বাড়িতেই বা কী বলব?'

বংকা অমায়িক হেসে বললো, 'আহা, ভদ্দরলোকের ছেলে তো। বামুন না হোক, কায়েত। আপনাদের তো অনেক কায়েত যজমানও আছে।'

গোরা চক্কোত্তি তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিলেন না। চোয়াল তাঁর নড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে ঠোঁট। তিনি খর চোখে আমার আপাদমস্তক একবার দেখলেন। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু মেজাজটা খারাপ হতে আরম্ভ করেছে। কে এই গোরা চক্কোত্তি, কেনই বা তাঁর আগমন, কী কারণেই বা জাতপাতের লেবু চটকানি। আমি বংকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

বংকা হেসে চোখ টিপে ইশারা করলো, 'ব্যাপার কিছুই নয়। কাবাবাবুদের আবার সব দিক বজায় রেখে চলতে হয় তো।'

বংকার ইশারায় একটা ইঙ্গিত আছে। ইঙ্গিতটা কাকাবাবুকে শান্ত করা। তা করুক। তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? অতএব, আমার রাগে বিরক্তিতেও কাজ নেই। হেসে বললাম, 'আমার কাজ তো ফুরিয়েছে। এবার আমি চলি।'

'এত কাণ্ডের পর চলে যাবেন কী!' বংকা অবাক চোখে তাকালো, 'তাই কখনো হয়? ওরা আমাকে যা তা বলবে।' চোখের ইশারায় শ্মশানের দিকে দেখালো।

'যেন চলি বললেই হয়ে গেল।' গোরা চক্কোত্তির মোটা কাঁসরে বক্রোক্তির ঝাঁজ। হাত দিয়ে আমার ভেজা জামাকাপড়গুলো দেখিয়ে হুকুম করলেন, 'নাও ওগুলো নিংড়ে রাখ। এদিকে ধোয়া জামাকাপড় পরে ফিটফাট তো হয়েছ, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়েছ। ওগুলোকে শুদ্ধ করতে হবে না? যাও, নিচে গিয়ে, গায়ে মাথায় ঝোলায় গঙ্গার জল ছিটিয়ে এস।'

হুকুমের নৌকা কি ডাঙায় চলে নাকি? এত হুকুম হুমকানি কিসের? মানতেই বা যাচ্ছি কেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'বোঝ?' গোরা চক্কোত্তিমশাই বংকার দিকে অবাক চোখে তাকালেন। তারপরেই আমাকে ঝেঁজে বললেন, 'মড়া যখন কাঁধে নিয়েছিলে, তখন ব্যাগটা তো গলায় ছিল। আর এই যে সব জামা-কাপড় পরেছ, এসব তো ব্যাগেই ছিল। ধোয়া না হয় না হল, গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে শুদ্ধ করতে হবে না? আবার জিজ্ঞেস করছ, কেন?'

মারবেন নাকি? চোটপাটের বহর দেখে, সেইরকমই মনে হচ্ছে। আমারও বাঁকা ঘাড় কেমন শক্ত হয়ে উঠলো। মড়া বয়েছি আমি। শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার

আমার। একটা ঠেক খেয়েছি বটে। একটু পরেই পথের টানে কোথায় চলে যাবো। তখন আমার জামা-কাপড়ে মড়া বহনের কথা লেখা থাকবে না। তবে কেন ওঁর হুকুম মানতে যাবো। আমি তো অশুদ্ধ বোধ করছি না। বিরক্ত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই বংকা হেসে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কাকাবাবু ঠিকই বলেছেন। মড়ার ছোঁয়া সব শুদ্ধ করে নিতে হয়। যান দাদা, একটু জলের ছিটে দিয়ে আসুন ভাই।'

আমি বংকার দিকে তাকালাম। আবার তার চোখে চোখটেপা ইশারা। গোরা চক্কোত্তি হাতে তালি মেরে ঝাঁজলেন, 'আমি তো তবু গঙ্গা জলের ছিটে দিতে বলেছি। অন্য কেউ হলে, আবার জলে চুবিয়ে নিয়ে আসতো।'

হাততালিটা বোধহয় চক্কোত্তিমশাইয়ের ঔদার্যের আত্মশ্লাঘা। তিনি আমাকে জলের ছিটাতেই নিষ্কৃতি দিয়েছেন। বংকা ঘন ঘন ঘাড় ঝেঁকে আমাকে ইশারা দিয়েই চলেছে। কেন, তাও বুঝতে পারি না। যদি নিয়ম-নীতির কথাই হয়, এত ঝাঁজ চোটপাট হুকুমদারি কেন? আমাকে শুদ্ধ করার এত রোষরুষ্ট ক্ষ্যাপা দাবীই বা তাঁর কিসের।

জিজ্ঞাসাগুলো মনের মধ্যেই দাপাদাপি করতে লাগলো। বংকার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছি না। অথচ অচেনা লোকের অকারণ হুমকি মেনে নিতে পারছি না। কেমন একটা অপমান বোধ করছি। বংকা বলে উঠলো, 'কাকাবাবু, তা হলে আমিই গঙ্গাজল নিয়ে আসি?'

'তুই আনবি গঙ্গাজল?' গোরা চক্কোত্তির স্বরে দ্বিগুণ ঝাঁজ, 'তুই তো এমনিতেই অশুদ্ধ। ওদেরও ছুঁতে বাকি রাখিসনি। তোর জলের ছিটেয় কখনো শুদ্ধ হয়? কেন, ও যাবে না?' তিনি আমার দিকে তাকালেন। একরাশ রেখায় এখন, মুখটা ভাঙাচোরা পাথরের মতো শক্ত। চোয়াল নড়েই চলেছে।

বংকার মুখের হাসিটা কেমন ঝিমিয়ে এসেছে। ইশারা ইঙ্গিত আর করছে না। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। গোরা চক্কোত্তি মশাই রীতিমতো খেঁকিয়ে উঠলেন, 'দুত্তোর নিকুচি করেছে সব লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকের ছেলের। গুরুজনের কথা মানতে চায় না।' বলতে বলতেই তরতরিয়ে নিচে নেমে গেলেন।

আবার একটা কী ঘটতে চলেছে। আমার বাঁকা ঘাড় নরম হয়ে এলো। বংকার দিকে তাকাবার অবকাশ পেলাম না। আমি দেখছি গোরা চক্কোত্তির দিকে। দেখছি, তিনি নিচে নেমে একেবারে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। নৌকার সাধকবাদকের দিকে তাকিয়ে কী যেন বললেন। সাধকবাদক ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাসছেন। একবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। নৌকার পিছনে ছইয়ের পিঠে হেলান দেওয়া রমণীর মুখও এখন এদিকে। ফরসা মুখে রোদের ঝলক। মুখের দুপাশে এলানো খোলা চুল। কালো চোখে, পুষ্ট

ঠোঁটে কৌতুকের ঝিলিক। সাধকবাদকের বাজনা গিয়েছে থেমে। তিনিও যেন চক্কোত্তিমশাইকে কী বললেন। জবাবে চক্কোত্তিমশাই কিছু বলে ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। তারপরে নীচু হয়ে দু' হাতের গণ্ডূষ ভরে জল নিলেন। উঠে এলেন তাড়াতাড়ি। আর আমার গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। কাঁধের ব্যাগটা বাদ দিলেন না শুধু, তার মুখ ফাঁক করে ভিতরেও দুফোঁটা ছিটিয়ে দিলেন। কাঁসরে ঝাঁজর বাজলো, 'দু ফোঁটা জল ছিটোতে এত বায়নাক্কা। শাস্ত্র না মানতে পার, গুরুজনের কথা শুনতে নেই ? চলো, এবার চলো।'

'হ্যাঁ দাদা, এবার যান।' বংকা বললো।

ক্রোধ চণ্ডাল বলেই জানতাম। কিন্তু সে কর্মেও সজাগ, এমন দেখিনি। আমি হতবুদ্ধি হয়ে চক্কোত্তিমশাইয়ের কাণ্ড দেখছিলাম। গুরুজনের কথার অবাধ্য হতে নেই, কথাটা মর্মে পৌঁছুবার আগেই, হঠাৎ তাড়া খেয়ে আবার থমকে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাবো ?'

'যেখানে যাবার, সেখানেই যাবে। আবার কোথায় যাবে ?' চক্কোত্তিমশাই আর যাই বলুন করুন, চোটেপাটেই আছেন। 'তোল তোল, ভেজা জামা-কাপড়গুলো তোল।'

বংকাও তাড়া দিল, 'হ্যাঁ, তুলুন দাদা, তুলুন। ছোঁবার উপায় থাকলে আমি নিজেই নিয়ে যেতাম।'

সব কথাই বোঝা গেল। কিন্তু যাবো কোথায় ? তাও আবার গোরা চক্কোত্তির সঙ্গে। এবার প্রায় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যেতে হবে. বলুন তো ?'

'যমের বাড়ি, বুঝেছ ?' চক্কোত্তিমশাই ঠোঁট বাঁকিয়ে, দু' হাত ঝাড়া দিলেন। মুখের ভিতর জিভের গোত্তায় চোয়াল নড়েই চলেছে। তার আসল কারণটা আগেই বুঝেছি। মশাইয়ের দাঁত নেই। বললেন, 'ব্যাটাছেলে, ভদ্দরলোকের ছেলে, আমার সঙ্গে যাবে, তার আবার এত কোথায়, কী বৃত্তান্ত কী দরকার ? ঘাটে দাঁড়িয়ে তো অনেক র‍্যালা হল আর কেন ?'

ব্যাটাছেলে এবং ভদ্দরলোকের ছেলে। যেতে হবে চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে। তারপরেও আবার জিজ্ঞাসা কিসের ? বলেই তো দিয়েছেন, যেতে হবে যমের বাড়ি। আর এও সত্যি, ঘাটে অনেক র‍্যালা হয়েছে। সেই র‍্যালা দেখেছেও অনেকে। না জেনে, এক বারবণিতার শবের চালি কাঁধে নিয়েছিলাম। সেটাকে ভাগ্য বলে মেনেছিলাম। কাঁধের চালি নামলেও কাঁধ এখনও খালি হয়নি। কোন সূত্রে গোরা চক্কোত্তিমশাইয়ের আগমন, জানি না। এখন তিনিই আমার কাঁধে। শব নন, হাঁকে ডাকে চোটেপাটে অতি জীবন্ত মানুষ। কিন্তু মানুষটাকে ঠিক চিনেছি, তা বলা যাবে না। গুরুজনের প্রতি অবাধ্য ছেলেকে নিজে গঙ্গাজল ছিটিয়ে কেমন একটা ধন্দ লাগিয়ে দিয়েছেন। অতএব, এটাও ভাগ্য বলে মানো। চলো যমের বাড়ি।

ভেজা জামাকাপড় তুলে নিলাম হাতে। গোরা চক্কোত্তিমশাই সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছেন, আমি একবার বংকার দিকে তাকালাম। সে হাতের ইশারা করে বললো, 'চলে যান।'

যে-রাস্তা দিয়ে চালি কাঁধে এসেছিলাম, চক্কোত্তিমশাই সেই পথেই চলেছেন। খানিকটা গিয়ে, মন্দিরের পাশ দিয়ে ডাইনে। তাঁর লম্বা পায়ের সঙ্গে তাল রাখা কঠিন। তবু পিছনে পিছনে চলেছি। তারপরে বাঁয়ে ঢুকে, কোথা দিয়ে কোথায়, ডাইনে বাঁয়ে করছেন, আমার জানার কথা না। সরু পথ, অলিগলি, পুরনো আর নতুন পাকা বাড়ি কাঁচা বাড়ির ঘিঞ্জি এলাকা পেরিয়ে চলে এলাম প্রায় যেন নিরিবিলি গ্রামের মধ্যে। আসলে গ্রাম না। গাছপালা, পোড়ো জমি, পুকুর, আঁশশ্যাওড়ার জঙ্গল। তারই ফাঁকে ফাঁকে পুরনো কোঠা বাড়ি। নতুন ছোটখাটো পাকা বাড়ি। মাথায় খড়ের চাল, মাটির ঘরও চোখে পড়ে। পোড়ো জমিতে গৃহস্থের গরু বাঁধা। ছাগল চরছে এখানে ওখানে। তার মধ্যেই দু একটি বাগান, ছোটখাটো পুকুর। দেখলে মনে হয় পাড়াটা প্রাচীন।

একটা পুকুরের ধার দিয়ে পোড়ো জমি পেরিয়ে চক্কোত্তিমশাই দাঁড়ালেন। সামনে একটি পুরনো একতলা বাড়ি। সাবেক কালের গজাল পোঁতা দেউড়িটা খোলা। ভিতরের কাঁচা উঠোনের একাংশ চোখে পড়ে। দক্ষিণ মুখো বাড়িটা পাঁচিলের আড়ালে।

চক্কোত্তিমশাই পিছন ফিরে একবার আমার দিকে দেখলেন। তারপর বাঁয়ে ধরলেন। বাঁদিকে একটা ঘর চোখে পড়েছিল আগেই। ইঁটের দেওয়াল, মাথায় টালি। সামনের বাঁধানো রকে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। চক্কোত্তি-মশাইকে অনুসরণ করে এগিয়ে দেখি ঘরটা একটা মুদী দোকান। পোড়োর পাশ দিয়েই ইঁট বাঁধানো রাস্তা। দোকানে আসতে হলে সেই রাস্তা দিয়েই আসতে হয়।

দোকানের মাঝখানে চৌকি পাতা। সামনে কিছু বড় বড় টিনের কৌটা, দু চারটে বেতের চুপড়ি, খানকয়েক চটের বস্তা এক পাশে, দেওয়ালের কাঠের থাকে রংবেরঙের কিছু মনোহারি দ্রব্যও আছে আর আছে কিছু কাঁচের বৈয়াম। বাকি ঘরটা প্রায় ফাঁকা। মালপত্রে ঠাসা জমাট দোকান না। বরং কেমন একটা দুর্দশাগ্রস্ত চেহারা। খরিদ্দারের মধ্যে একটি ফ্রক পরা বালিকা, এক বৃদ্ধা। আর একজন রোগা খাটো মধ্যবয়স্ক গায়ে কাঁথা জড়ানো লোক। একটা কুকুর শুয়ে ছিল রকের এক কোণে। সে একবার চোখ মেলে আমাদের দেখলো। আবার চোখ বুজলো।

দোকানের গদীতে যিনি আসীন, তাঁর মাথায় ঘন কালো চুল না থাকলে, চক্কোত্তিমশাইয়ের যমজ ভাই মনে হতো। তা ছাড়া, গায়ে চাদর মহাজনের

দাঁতে কামড়ে ধরা ছিল জ্বলন্ত বিড়ি। চক্কোত্তিমশাইকে দেখামাত্র বিড়ি নামিয়ে হাতের আড়াল করলেন। তাকালেন আমার দিকে।

‘এস।’ চক্কোত্তিমশাই আমাকে ডাক দিয়ে রকে উঠলেন।

এটাই যমের বাড়ি কী না, জানি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা মানেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। সেটা বুঝে নিয়েছি। ওতে জলাঞ্জলি। আমি রকে উঠলাম। চক্কোত্তিমশাইয়ের পিছনে পিছনে দোকানে ঢুকবো কী না ভাবছি। তিনি নিজেই পিছু ফিরে ডাকলেন, ‘কী হল ? দাঁড়ালে কেন ?’

কোনো জবাব না দিয়ে ঢুকলাম। দোকানের একটা পাশ ফাঁকা। দেওয়াল ঘেঁষে একটা পুরনো নড়বড়ে বেঞ্চি পাতা। চোখে পড়লো, পিছন দিকে একটা পাল্লা-ভেজানো দরজা। চক্কোত্তিমশাই বেঞ্চিটা দেখিয়ে বললেন, ‘এখানে বস। আমি আসছি।’ দরজার দিকে দু পা গিয়ে, গলায় একটা অদ্ভুত শব্দ করে আবার ফিরে দাঁড়ালেন। মুখের ভাঁজে খাঁজে অসীম বিরক্তি। দৃষ্টি আমার হাতের ভেজা জামাকাপড়ে। মোটা কাঁসরের আওয়াজে ঝাঁজ কিঞ্চিৎ কম, ‘সেই ঘাটে থাকতে বলেছি, জামাকাপড়গুলো নিংড়ে নাও, কিন্তু কথা শুনতে ইচ্ছে করে না। এরপরে এগুলো শুকোবে কখন ?’

আমি তাড়াতাড়ি রকের দিকে পা বাড়াবার উদ্যোগ করলাম, ‘এখুনি নিংড়ে দিচ্ছি।’

‘আর থাক।’ চক্কোত্তিমশাই বলতে গেলে আমার হাত থেকে ভেজা জামা-কাপড়গুলো ছিনিয়ে নিলেন। ফিরে দরজার ভিতরে যেতে যেতে বললেন, ‘ওখানে বস।’ দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এক পলকের দেখা। মনে হলো, দরজার ভিতরে লম্বা একটা ঘরের মেঝে। লোকজন কেউ নেই। আমি বেঞ্চিতে বসবার আগে একবার গদীতে আসীন মহাজনের দিকে তাকালাম। তিনিও তাকিয়ে ছিলেন। চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হাতের আড়ালে রাখা পোড়া বিড়িটি আবার দাঁতে কামড়ে ধরলেন। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরালেন। তারপরে, প্রায় সেই মোটা কাঁসরের গম্ভীর ঝংকার, ‘কী হল রে কুসি, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? তোর চিঁড়ে গুড় তো দিয়ে দিইচি।’

ফ্রক পরা বালিকা বললো, ‘কাপড় কাচা সাবান দেবে না ?’

‘অহ্, কাপড় কাচা সাবান চাইলি, না ?’ মহাজন ডানদিকে ঝুঁকে একটা বড় টিনের মধ্যে হাত গলালেন। বের করলেন ছোটখাটো একখানি বাতাবী লেবুর মতো সাবান। হাত বাড়িয়ে কুসির দিকে দিলেন।

কুসির বাঁ হাতে ঠোঙা। ডান হাতে সাবান নিয়ে রক থেকে নেমে গেল। মহাজন একখানি লাল খেরোর খাতা তুলে নিয়ে বললেন, ‘কুসি, তোর বাবাকে আজকালের মধ্যে দেখা করতে বলিস।’

কুসি তখন পোড়োয়। মুখ না ফিরিয়েই বললো, ‘আচ্ছা।’

মহাজন হাতের কাছে দোয়াতে কলম ডুবিয়ে কিছু লিখতে লাগলেন। আর ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করলেন। লেখা হয়ে গেলে, দাঁতে কামড়ে ধরা বিড়িতে ঠোঁট টিপে টানলেন। নিভে গিয়েছে। বিড়িটা হাতে নিয়ে কালো রোগা লোকটির দিকে তাকালেন, ‘হ্যাঁ, অই যা বলছিলাম, বুঝলি গোবরা, বামুনের দোকান বটে, বামুনের গরু তো নয়, বাঁট টিপলেই দুধ বেরোবে ? সাত ছটাক তেলের দাম বাকি। আর এক ছটাকও ধারে দিতে পারব না।’

‘বামুনের গরু কি আর সেই গরু আছে দাদাঠাকুর ?’ বৃদ্ধা হাসলো, ‘গরু সব সমান। যেমন খাওয়াবে, তেমনি দেবে।’

মহাজনের দাঁত বেরিয়ে পড়লো। হাস্য না দন্তপেষণ, ‘তবু জানবে, বামুনের গরু হল বামুনের গরু। সব গরু এক হলেই হল ?’

দরিদ্র বৃদ্ধাটির গায়ে ময়লা একটা থান। ধুসর চুল মাথায় ঘোমটা। হেসে বললো, ‘বুইচি দাদাঠাকুর, তুমি কামধেনুর কথা বলচ। তোমাদের গরু হল কামধেনু।’ বলতে বলতে ফোগলা বুড়ির খিক্ খিক্ হাসি আর থামে না।

‘খুব কথা শিখেছ, না ?’ মহাজন খ্যান খ্যান করে বাজলেন, ‘মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করো না। আমাকে কামধেনু বোঝাতে এসেছ ?’

বুড়ি হাসতে হাসতে মাথা নাড়লো, ‘তোমাকে আমি কি শেখাব গো ? আমাদের গরু অবোলা জীব, তোমাদের গরু কামধেনু। বাঁট টিপলেই দুধ।’

‘তুমি যাবে, না বাচলামো করবে ?’ মহাজন কাঁসরে ঝাঁজরে দোকান কাঁপিয়ে, প্রায় উঠে দাঁড়াবার উদ্যোগ করলেন, ‘চটকলে ছেলের কাজ পাকা হয়েছে বলে ধরাকে সরা দেখছ ?’

আমি কেবল অবাক হচ্ছিলাম না। বৃদ্ধার হাসি যেন আমার ভিতরেও চুইয়ে ঢুকছে। অনেক সাহসী বৃদ্ধা দেখেছি। কিন্তু এমন রসিকা দেখি নি। তারপরেও বলে কী না, ‘এ বয়সে আর কী বাচলামো করব দাদাঠাকুর। তুমি বামুনের গরুর কথা বললে, তাই বললাম। তা, আমার ডাল মশলা দেবে তো।’

‘না, দেব না।’ মহাজন হেঁকে হাত ঝাড়লেন, ‘অনেক দিইচি, আগের টাকা শোধ কর, তারপরে দেখা যাবে। বুড়ি হয়ে মরতে চলল, এখনো মস্করা গেল না।’

বৃদ্ধার হাসিটি তবু অটুট, ‘মস্করা করিনি ঠাকুর। পা তো বাড়িয়ে আছি, যমে নেয় না যে। তা, মাল দেবে না তা'লে ?’

‘না, দেব না। আগের দেনা শোধ কর। অনেক পাওনা হয়েছে।’ মহাজনের স্বরের ঝাঁজ বাজ একই রকম, ‘ছেলেকে বলবে, এ হপ্তাতেই সব পাওনা মেটাতে হবে।’

বুধা হুস্ করে একটা নিঃশ্বাস ফেললো, কিন্তু মুখে হাসি, 'তাই বলব। তুমি মাল দিলে না, এখন যাই আবার ইস্টিশনের মিশিরজীর দোকানে।'

'তাই যাও।' মহাজন বললেন, 'আমার কাছে আর ধারে কারবার চলবে না। এ হপ্তায় আমার টাকা মেটানো চাই।'

বুধা ইতিমধ্যে রক থেকে নিচে পা বাড়িয়েছে। আবার বললো, 'বামুনের গরু, বাঁট টিপলেই দুধ বেরোয়, তোমার কথাই বলেচি, মিছে তো বলি নি।' বলতে বলতে পোড়োয় হাঁটা দিয়েছে।

মহাজনের চোখে আগুন, দাঁতে হিংস্রতা। আর আমি যদি ঠিক দেখে থাকি, হাসির দমকে বুধার শরীর কাঁপছে। কিঞ্চিৎ খিক্ খিক্ শব্দও যেন শোনা গেল। মহাজন সেই পোড়া বিড়িটাই আবার দাঁতে চেপে ধরলেন। দেশলাই হাতে নিয়ে কাঠি জ্বালাতে গিয়েও জ্বালালেন না। বিড়িটা হাতে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'দেখলি তো গোবরা, একে ছোটলোক, তায় বেইমান। মাগীর রস আর ধরে না।'

'পাগল।' গোবরা নামে লোকটি হেসে বললো, 'বুড়ি যেখেনে যায়, সেখেনেই হ্যালফ্যাল কথা বলে আর হাসে।'

মহাজন ঝেঁজে উঠলেন, 'না না, তুই জানিসনে। বুড়ি প্রায়ই আনকা কথা তুলে আমার পেছনে লাগে। ও আমাকে কী ভাবে?'

'বুড়িটার স্বভাবই ওইরকম।' গোবরা বললো, 'মানীর মান দিতে জানে না। আপনি ঠিক করেচেন দাদাঠাকুর, ওকে আর ধারে মাল দেবেন না।'

মহাজনের স্বর বদলালো, 'না, তুই ভেবে দ্যাখ। আমি একটা কথার কথা বলেছি, তাই নিয়ে আমাকে ঠাট্টা তামাশা করবে, চিপটেন কাটবে?'

'নচ্ছার বুড়ি।' গোবরা কথাটা বলতে গিয়ে একবার আমার দিকে দেখে নিল, 'নইলে আপনার সঙ্গে মস্করা করে?'

মহাজনের স্বর আর এক ধাপ নিচে নামলো, 'হ্যাঁ, বুড়ি আসে, বসে, এপাড়া ওপাড়ার দশজনের কেচ্ছা করে, অনেক মজার মজার কথা বলে, শুনে আমিও হাসি। ওসব গালগপ্পো কেচ্ছা শুনতে কার না ভালো লাগে। তা বলে আমার পেছনে লাগবে?'

অচেনা বুধার আঁকিবুঁকি রেখা মুখে হাসি দেখেছি। এখন যেন তার চরিত্রের একটা পরিচয়ও ফুটে উঠছে। রসিকা সে নিঃসন্দেহে। সাহসটা আসলে যুগিয়েছেন স্বয়ং মহাজনই। পরের কেচ্ছা শুনে মজা লুটেছেন। নিশ্চয় বুড়ির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিস্তর হাস্য করেছেন। আজ কী কুক্ষণে বামুনের গরুর গান ধরলেন। বুড়ি সেইটি নিয়ে কামধেনুর মস্করা জুড়লো। না বুঝেই কি জুড়েছিল? মনে হয় না। ওটাও একরকমের কেচ্ছার খোঁচা। পরের কেচ্ছায় হাসা যায়। নিজের কেচ্ছা বুকে বাজে। মহাজন ক্রুদ্ধ হবেন বইকি।

'বজ্জাত বুড়ি।' গোবরাও যেন রেগে উঠলো। মহাজনের মুখের দিকে তাকিয়ে, সে ক্রমে তাগ্ করতে লাগলো। প্রথমে 'পাগল' তারপরে 'নচ্ছার'। এখন 'বজ্জাত'।

মহাজন বললেন, 'ঠিক বলিছিস। কেবল বজ্জাত নয়, হাড় বজ্জাত।'

'খচ্চর বুড়ি!' গোবরার ইতর বিশেষণ আরও তীক্ষ্ণ হলো, 'তেল নিয়ে কথা হচ্ছিল আমার সঙ্গে, আপনার বামুনের গরুর কথা তো মিছে বলেননি। সে কথায় তোর নাক গলাবার কী দরকার? এত বড় সাহস, আপনার সঙ্গে মস্করা করে? হারামজাদীর মুখে ঝাঁটা।'

মহাজন প্রসন্ন মুখেই দাঁতে বিড়ি কামড়ে ধরলেন। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরালেন, 'যা বলেছিস! দে, তোর তেলের বোতলটা দে।'

গোবরা চাদরের ভেতর থেকে বের করলো ঢাউস একটা বোতল। বোতলের গলায় দড়ি বাঁধা। এক ছটাক তেল গায়েই লেগে থাকবার কথা। তবু সার্থক। এক ছটাক তেল আদায়ের জন্য বুঝে সুঝেই তাগ্ কষেছে। বোতলটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বললো, 'সত্যি বলছি দাদাঠাকুর, ইচ্ছে করছিল বুড়িটাকে মেরে তাড়াই।'

মহাজন তখন ছটাকি মাপের টিনের পাত্রে তেল তুলে বোতলে ঢালছেন। বাহ্‌রে গোবরা। কে বললে, কথায় চিঁড়ে ভেজে না? সময় আর সুযোগ বুঝে বলতে পারলে, ঠিকই ভেজে। বুধার কাছে তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু গোবরা হলো নিরুপায় ছিঁচকে। বুধার বুকের পাটায় সমাজ দর্পণের রসের খেলা। আর এই মহাজনকে কী বলবো? ঢাকির ঢাক?

ইতিমধ্যে এক গলা ঘোমটা ঢাকা এক কলাবউ আর একটি আট দশ বছরের খদ্দের এসে গেল। গোবরা বোতল নিয়ে চলে যেতে যেতে বললো, 'ওবেলা আসব দাদাঠাকুর।'

কিন্তু আমি এখানে বসে কি এই খেলাই দেখে যাবো? মাঘের বেলায় জামাকাপড় কখন শুকোবে, সেই আশায় বসে থাকা পাগলামি। ঘাটের সিঁড়িতে মেলে দিলে তবু কিঞ্চিৎ ভরসা ছিল। এখন চলে যাবারও উপায় নেই। জামাকাপড়গুলো ফেলে যাওয়া সম্ভব না।

'এস।' গোরা চক্কোত্তিমশাই ভেজানো দরজা খুলে ডাকলেন, 'ভেতরে এস।'

আমি এক মুহূর্ত দ্বিধা করে উঠে দাঁড়ালাম। এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। চক্কোত্তিমশাই আমার পায়ের দিকে দেখে বললেন, 'স্যাণ্ডেল দুটো এখানেই খুলে রাখ।'

কোনো জিজ্ঞাসা অবান্তর। আবার চোটপাটের কাঁসর ঝাঁজর বেজে উঠবে। স্যাণ্ডেল খুলে চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম। তিনি দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলেন। দেখলাম, পূব-পশ্চিমে লম্বা দালান।

দেওয়ালের চুনবালি খসা। মাথার ওপরে কড়ি বরগায় ক্ষয় ধরেছে। জায়গায় জায়গায় ছাদ চোঁয়ানো জলের দাগে শ্যাওলার রঙ। দালানের বাইরের রকে নানা খানে ভাঙাচোরা ফাটল। রকের নিচে উত্তরে কুয়োতলা। সীমানার পাঁচিলের নোনাধরা ইঁটে ভাঙন ধরেছে। পাঁচিলের পুব ঘেঁষে একটা আমগাছ। দালানের দক্ষিণ দিকে সারি সারি ঘর। ক'টা ঘর, তার হিসাব এক পলকে পাওয়া যায় না।

'এই যে, এদিকে এস, এখানে বস', চক্কোত্তিমশাই ডাকলেন।

দেখলাম, দরজার কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে মেঝের ওপর আসন পাতা। আসনের সামনে কাঁসার থালায় ভাত। দু তিনটি বাটি আর কাঁসার গেলাস। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ভাত থেকে ধোঁয়া উঠছে। ব্যঞ্জনাদি কী আছে জানি না। কিন্তু যতোই অবেলা হোক জিভে জল এসে পড়লো। ভিতরে ভিতরে মহাপ্রাণীটি সেই ঘাটে থাকতেই খাবি খাচ্ছিল। মনে মনে হোটেলের কথা ভেবে রেখেছিলাম। এতক্ষণে রুকি লতাদের ব্যবস্থার ধরতাই পাওয়া গেল। কিন্তু এত ঝক্কি পোহাবার কী দরকার ছিল?

সে প্রশ্ন পরে। আমি পায়ে পায়ে আসনের দিকে এগিয়ে গেলাম। মেঝের শান ফাটা চটা। অজস্র দাগে ভরা পুরনো গাছের মতো। চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'বসে পড়, বসে পড়। বংকা এসে খবর দেবার পরে ভাত বসানো হয়েছে। তখন তো আর আলাদা করে রান্না করার উপায় ছিল না। বাড়িতে যা ছিল, তাই দিয়েছে।'

আশেপাশে আর কারোকে দেখতে পাচ্ছি না। দালানের পুবের সীমানায় ডেয়ো-ঢাকনার ঠুকঠাক শব্দ পাচ্ছি। কোনো ঘরে কারা কথা বলছে নিচু স্বরে। সেই সঙ্গে শিশুর ঘ্যানঘ্যানে কান্না। আমি আসনে বসে বললাম, 'এই যথেষ্ট।'

'যথেষ্ট, কি আর কিছু তা জানিনে বাপু।' চক্কোত্তিমশাই আমার মুখোমুখি উলটো দিকে মেঝেতে বসলেন, 'সব শুনে-টুনে প্রথমে রাজী হই নি। বংকোটা ছাড়ল না। অনেক করে বোঝালে। ফিরিয়ে দিলে পরে আমার পেছনে লাগত। কোন্ পাড়ায় থাকে, তা তো জানোই। তার ওপরে আবার গুণ্ডা মাতাল। কথা না রাখলে কোন্ দিন মাথায় ডাণ্ডা মারতো।'

গরম ভাতের পাতের সামনে বসে নিজেকেই কেমন অপরাধী মনে হলো। বললাম, 'গুণ্ডা নাকি? কথাবার্তা শুনে তো ভালোই মনে হচ্ছিল।'

'তা হবে না কেন? ছেলে তো বামুনের ভদ্দর ঘরের। লেখাপড়াও কিছু শিখেছিল।' চক্কোত্তিমশাই চাদরের ভিতরে হাত দিয়ে কোমরের কাছ থেকে বের করলেন একটি ছোট কৌটা। ঢাকনার মুখ খুলে, তুলে নিলেন একটি বিড়ি, 'ওর বাপ হল চুঁচড়ো কোর্টের উকীল। আর তার ছেলে দেখ, মেয়েমানুষ নিয়ে বেশ্যাপাড়ায় পড়ে আছে। শ্মশানে একটা মেয়েকে দেখলে

না, দেখতে শুনতে ভালো, নামটা যেন কী? বছর খানেক আগে বর্ধমান থেকে এসেছিল। তো, তাকে নিয়ে কী হুজ্জোত। মারামারি লাঠালাঠি থানা পুলিস কিছু বাকি ছিল না। শেষ পর্যন্ত বংকার কাছে সবারই হার—।' হঠাৎ কথা থামিয়ে আমার পিছনে মুখ তুলে তাকালেন, 'অ্যাঁ? কিছু বলছ?'

'হ্যাঁ, বলছি আগে খেতে দাও, তারপরে ওসব কথা পেড়ে বসো।' আমার পিছনের ঘর থেকে স্ত্রী-কণ্ঠ শোনা গেল।

ঘাটের গোরা চক্কোত্তিমশাই, আর এই মশাইয়ে ফারাক। চোয়াল নড়ছে না, গলায় ঝাঁজর বাজছে না। লম্বা কালো মুখখানি এমনিতেই একটু রোখা। কিন্তু রুক্ষতা নেই। বললেন, 'তা ও থাক না। আমি তো কথা বলছি। পুষিকে বলতো, আমাকে একটা দেশলাই দিতে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাও, তুমি খাও। আগে গোবিন্দের ভোগটুকু খাও। ওটা আমাদের গৃহদেবতার নিত্যভোগ।'

আমি পাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ভাতের সামনে এক পাশে একটু খিচুড়ি, এক চিলতে বেগুন ভাজা, সামান্য পায়েস। পাতে হাত দেবার আগে, ঘরের থেকে বেরিয়ে এলো ষোল সতেরো বছরের একটি মেয়ে। বয়সটা অনুমান, চোখে লাগছে তরুণী। লালপাড় শাড়ি আর লাল জামা। খোলা চুল পিঠে এলানো। একটি দেশলাই বাড়িয়ে দিল চক্কোত্তিমশাইয়ের দিকে। এরই নাম বোধ হয় পুষি। দেশলাই দিয়ে ঘরে পা বাড়াবার আগে একবার আমার দিকে তাকালো। তা তাকাক, কিন্তু ঠোঁটের কোণে হাসিটি কী কারণে? অপরিচিতের দুর্দশা দেখে? দুর্দশা না হোক, অবস্থাটা এক-রকমের অসহায় তো বটেই। পথে বেরিয়ে কপালে অন্নের লিখন কোথায় কখন কেউ বলতে পারে না। সেই হিসাবে এ পরিবেশটা খুব সহজ না।

না-থাক। গোবিন্দের ভোগ তুলে মুখে দিলাম। আর চক্কোত্তিমশাই তৎক্ষণাৎ আওয়াজ দিলেন, 'আজকালকার ছেলেদের এই হলো হাল। ভোগ মুখে দেবার আগে একবার কপালে ছোঁয়ালে না?'

দেখলাম, মশাইয়ের চোয়াল নড়ছে। মুখেও বিরক্তি। স্থান মাহাত্ম্যেই বোধ হয় ধমকে উঠলেন না। আমি বিব্রত হেসে বললাম, 'খেয়াল ছিল না।'

চক্কোত্তিমশাইয়ের দৃষ্টি আবার আমার পিছনে, ঘরের দিকে। ঈষৎ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, খাও।' ঠোঁটে বিড়ি গুঁজে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরালেন।

বোঝা গেল, আমার পিছনেই ঘরের দরজার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে। একটু-আধটু ফিসফাসও শুনতে পাচ্ছি। অতএব, পিছনে একজনের অধিক বর্তমান। চক্কোত্তিমশাই সেখান থেকে সঙ্কেত পাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিচ্ছেন।

কিন্তু আমার ভিতরটা কেমন গুটিয়ে গেল। গেলেও কোনো উপায় নেই। ভোগ খেতে হলে কপালে ছোঁয়াতে হয়, তেমন সদাধর্মে সজাগ নই। খেতে আরম্ভ করলাম। গোবিন্দেব ভোগের পরেই পাতের ওপরে উচ্ছে বেগুনের চচ্চড়ি। কথায় বলে, তেতো আর পোড়ার মুখে সবই ভালো। অর্থাৎ বেগুন পোড়া বা যে-কোনো তিক্ত ব্যঞ্জন বা ভাজা। ভোজন রসিকের কথা। বসন্তে কচি নিম পাতা ভাজা বা ঝোল, অন্য সময়ে পলতা পাতা উচ্ছে করলা, নানা প্রকার। পাতের পাশে এক বাটিতে ডাল, বাঁধাকপির তরকারি এক বাটিতে। অন্য বাটিটিতে গাঢ় রঙের ঝোলের মধ্যে কুচো চিংড়ি ভাসতে দেখছি। কুচো চিংড়ির বড়া বা মাখা মাখা ব্যঞ্জনই ভালো জমে। ঝোল কেন?

'আমি অবশ্যি বংকাকে বলেছিলাম, এ অবেলায় মাছটাছ খাওয়াতে পারব না।' চক্কোত্তিমশাই একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'তার চেয়ে হোটেলে নিয়ে যা, সবই পাবি।'

পিছন থেকে স্ত্রী-কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তির শব্দ শোনা গেল। তারপরে, 'ওসব কথা পরে বললেও তো হবে।'

চক্কোত্তিমশাই মুখ তুলে একটু বিব্রত হলেন। এবং পরমাশ্চর্য, তাঁর ঠোঁটে ঈষৎ হাসির আভাস। পিছনে ঘরের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা বুজিয়ে মাথা নাড়লেন, 'আহা, আমি খারাপ ভেবে কিছু বলছিনে। ওর খাওয়ার কথা ভেবেই বলছি। বংকাদের ইচ্ছে ছিল, ওকে একটু ভালো মন্দ খাওয়াবে। সেই কথাই বলছিলাম।'

এখন আমি পিছন থেকেই কেবল সাহস পাচ্ছি না। হাঁবডাক চোটপাটের মশাইটির প্রাণের নিরিখও যেন কিঞ্চিৎ পাচ্ছি। পেয়েছিলাম ঘাটেই, যখন নিজে গঙ্গাজল এনে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। তারপবে বাড়িতে এসে, নিজের হাতেই আমার ভেজা জামাকাপড় নিয়ে যাওয়ার মধ্যেও, মুখ মনের ফারাকটা বোঝা গিয়েছিল। বললাম, 'হোটেলে তো আমি নিজেই যেতে পারতাম। ওরা এসব ঝঞ্ঝাট করতে গেল কেন, তাই বুঝতে পারছি নে।

'না, তা ওরা করবে না। ওদের ইচ্ছে হল, তোমাকে কোন সদ ব্রাহ্মণ গেরস্থের ঘরে খাওয়াবে।' চক্কোত্তিমশাই চোপসানো গালে বিড়িতে টান দিলেন, 'নইলে নাকি তোমার ইজ্জত দেওয়া হবে না। তাই আমার কাছে এসেছিল। কিন্তু এ অবেলায় ভালো মন্দ কী আর খাওয়াব।'

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সিঁধঠাকুর, দুর্গাদেবী, সন্ধেতারা, রুকি আর লতাদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ছবি। বংকার দৌড়ে চলে যাওয়া। তারপরে রুকি লতাদের ব্যবস্থার বয়ান। তাছাড়া সিঁধঠাকুরের 'সেবা'র কথাটাও মনে আছে। এই সেই ব্যবস্থা এবং সেবা। ব্যবস্থাটা মন্দ বলবো না। কিন্তু বিস্তর ঘোরাপথের ব্যবস্থা। রুকি বা লতা ভেঙে বলতে চায় নি কেন? বোধ হয় আশঙ্কা ছিল ব্যবস্থাটা হয়ে উঠবে কী না। অথবা আমিই বিগড়ে বসি।

পুব দিকের দালানের প্রান্তে উত্তরের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো ঘোমটা মাথায় এক বিবাহিতা। নীল পাড় তাঁতের শাড়ি জড়ানো। ঘোমটার বাইরে মুখ দেখে মনে হয়, বয়স তিরিশের ঘরে। বাঁ হাতে একটি থালা ডান হাতে পেতলের হাতা। এগিয়ে আসতে দেখলাম, ভাতের থালা। হাতায় করে তুলতে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে, আমার থালা আগলে বললাম, 'আর দেবেন না।'

'আর দেবে না কী হে।' চক্কোত্তিমশাই এবার একটু ধমকের সুরে বাজলেন, 'ঐ কটা তো ভাত দিয়েছে। ওতে কি পেট ভরে? দাও না ছোটবউ।'

ছোটবউয়ের মাজা মুখে, ভাসা চোখে হাসি। হাতায় ভাত তুলে ঝুঁকে পড়লেন। আমি আবার বললাম, 'সত্যি আব পারবো না। লাগলে চেয়েই নিতাম।'

'কেমন চেয়ে নিতে, সে তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি।' চক্কোত্তিমশাই পিছনে চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'ঐ নরম গোবেচারা মুখ দেখেই, সেই বেটিরা তোমার ঘাড়ে চালি চাপিয়ে দিয়েছিল। ওদের ছলাকলা তুমি কি করে বুঝবে? লোক ভোলানো ওদের পেশা। আর তুমি ভাবলে আহা, মেয়ে-মানুষ মড়া বইছে। বলছে যখন কাঁধ দিই। তুমি কি জানতে, ওরা বেশ্যা?'

পিছনে স্ত্রী-কণ্ঠে বিরক্তি, 'কী যন্ত্রণা। ওসব কথা পরে হবে। এখন খেতে দাও।'

'আহা, আমি কি ওর হাত ধরে আছি?' চক্কোত্তিমশাইকে এবার সামলানো গেল না।

'বলুক না, ও কি জানতো, ওরা কারা—কী হে, বলো না, তুমি জানতে?' আমার দিকে তাকালেন।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না, কী বরে জানবো বলুন। জীবনে তো কখনো মেয়েদের শ্মশানযাত্রীই দেখি নি। আর কারো গায়ে তো তাদের পেশা পরিচয় লেখা থাকে না।'

'জানলে কি কখনো নিতে?' চক্কোত্তিমশাইয়ের চোখের কোণ কুঁচকে উঠলো। চোয়াল নড়ছে।

বেগতিক, খুব বেগতিক। চক্কোত্তিমশাইয়ের জিজ্ঞাসাটা যেন খাঁড়ার মতো বাঁকা। অধম এই কায়স্থ সন্তানটিকেই তিনি বাড়িতে আনতে প্রথমে রাজী হন নি। পরে কী মনে করে, রাজী হয়েছিলেন। এখন তিনি কী জবাব প্রত্যাশা করছেন, তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। প্রত্যাশা না, সেটাই তাঁর দাবী। বললাম, 'জানলেও নিতাম না, যদি দেখতাম সবাই বেশ শক্ত অল্প বয়সের।'

চক্কোত্তিমশাইয়ের কপালে সাপ কিলবিলিয়ে উঠলো। কেশহীন ভুরুতে গাঢ় ত্রিকোণ। জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে ?'

'ওসব মানে টানে পরে জানলেও হবে।' পিছনের স্বরে শোনা গেল, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন ছোট, অন্তত একহাতা ভাত দে। একবার তো দিতে নেই।'

অতএব ছোটবউ একহাতা ভাত দিয়ে দিল পাতে। আমার মস্তিষ্কে বিঁধে আছে চক্কোত্তিমশাইয়ের 'মানে'। আমার জবাবটা তাঁকে কিঞ্চিৎ ধাঁধায় ফেলেছে। ছোটবউ চলে যাবার আগেই পিছনের স্বর শোনা গেল, 'আর একটু ডাল আর বাঁধাকপির তরকারি এনে দে।'

আমি ব্যস্ত হয়ে, পিছনে ঘাড় ফেরাতে গেলাম। কাঁধের শাল পড়ে গেল একপাশে। এক মুহূর্তের জন্য চোখে পড়লো, মধ্যবয়স্কা মহিলার গোল ফর্সা মুখ। তাঁরও লাল পাড় শাড়ি। মাথায় ছোট করে ঘোমটা টানা। কপালে সিঁদুরের টিপ। বললাম, 'আমার আর কিছু লাগবে না।'

'তবে থাক।' পিছনের স্বর অনুমোদন করলেন।

ছোটবউ চলে গেল। চাদরটা পরে তুললেও চলবে। কুচো চিংড়ির ঝোল ঢেলে, ভাত মেখে মুখে দিতেই আক্কেল গুড়ুম। ঝাল ঝোল কিছুই না। কুচো চিংড়ি দিয়ে পাকা তেঁতুলের অম্বল ! আর আমি ঝাল ঝোলের স্বাদের আশায় ভাত মেখে ফেলেছি বেশি। উপায় নেই। অবিকৃত মুখে গ্রাস তুলে নিলাম।

'হুম, বুঝেছি।' চক্কোত্তিমশাই হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে দেখি, সেই ঘাটের মুখ, কিন্তু হুমকে উঠলেন না। দাঁত না থাকলেও একরকম চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন 'তার মানে জানলেও নিতে। ওসব অল্প বয়স শক্তপোক্ত মন যোগানো কথা। তুমিও তা হলে কর্মনিষ্ঠ দলের লোক ?'

কর্মনিষ্ঠ ! সেটা আবার কী ? দালানের পূর্ব প্রান্তে তখন পুষির আবির্ভাব ঘটেছে। বোধ হয় ঘরের ভিতর দিয়ে দরজা আছে ওদিকে যাবার। হাতে ওর দুই রঙের দুটো বাটি। ডেকে উঠলো, 'বাবা !'

'কেন, তোর মেজদা বাড়ি আছে নাকি ?' চক্কোত্তিমশাইয়ের পাতলা ঠোঁট বেঁকে উঠলো, 'থাকলেও আমার কাঁচকলা।' বাঁ হাতের বুড়োআঙুষ্ঠ দেখিয়ে সোজা চলে গেলেন পশ্চিমে। সেদিকেও দক্ষিণে একটি ঘরের দরজা খোলা। ঘরে ঢোকবার আগে, বলে গেলেন 'ওসব কথার কারচুপি দিয়ে আমাকে ভোলানো যাবে না। বুড়ি বেশ্যাদের ওপর বড় দয়া !'

কী দুর্বিপাক ! হাত এখন পাতে, মুখে গ্রাস তুলতে পারছি না। মশাই ধরেছেন ঠিক। পিছনের মূর্তি এবার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ফিসফিস করে বললেন, 'বোকা ছেলে। বললেই পারতে, জানলে নিতুম না। নাও, খেয়ে নাও।' মুখ ফিরিয়ে স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'নিয়ে আয় পুষি।'

গতিক বোধ হয় সুবিধার না। তাড়াতাড়ি খেয়ে এঁটো হাতেও পালাতে পারি। কিন্তু জামাকাপড়গুলো ? বোকা তো আমি নিঃসন্দেহে। অন্যথায় চক্কোত্তিমশাইয়ের মন বুঝেও, নিজের মন খুলে সত্যি বলতে যাই ? কিন্তু এখন আর কথা ফেরাবার ঘোরাবার উপায় নেই। গলার স্বর নামিয়ে বললাম, 'উনি খুব রেগে গেছেন।'

মধ্যবয়স্কা হাসলেন। অটুট দাঁত, ঠোঁটে তাম্বুলের ছাপ। কপালের সামনের চুলে কিছু রুপোলী ঝিলিক। দক্ষিণের পাশের ঘরের দিকে একবার দেখে নিলেন। নিচু স্বরে বললেন, 'ওই রকম। তোমাকে ভাবতে হবে না, খেয়ে নাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অনুমান, ইনিই চক্কোত্তিমশাইয়ের ভর্ত্রী। মহাদেবের কোপ থেকে বাঁচাতে ইনিই এখন দেবী। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, দয়া করে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন। কিন্তু কর্মনিষ্ঠ দলটা কী ? পুষি এগিয়ে এসে সামনে দুটি বাটি রাখলো। একটি পাথরের বাটিতে দই। অন্য কাঁসার বাটিতে এক গুচ্ছের সন্দেশ রসগোল্লা। আমাকে রাক্ষস ভেবেছে নাকি ? কোনো রকমে উঠতে পারলে বাঁচি। উদ্বেগে বললাম, 'ওরে বাবা, এসব আমি কিছুই খেতে পারবো না, নিয়ে যান।'

পুষি তাকালো মহিলার দিকে। তিনি বললেন, 'এসব বংকার ব্যবস্থা। ও মিষ্টির দোকানে বলে গেছলো, পুষি গিয়ে নিয়ে এসেছে। একটু তো খেতেই হবে।'

কিন্তু খাওয়া যে মাথায় উঠেছে, তা কি উনি বুঝতে পারছেন না ? তাছাড়া, এত দই মিষ্টি খাওয়া কোনো রকমেই সম্ভব নয়। আমি উভয়ের দিকে অসহায় চোখে তাকালাম, বললাম, 'বিশ্বাস করুন, পেটে আর জায়গা নেই।'

'পেটে জায়গা ঠিকই আছে। ভয়েই সব ভরে গেছে।' মহিলা হেসে তাকালেন পুষির দিকে।

পুষি খিলখিল করে হেসে উঠেই মুখে আঁচল চাপা দিল। উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ একটু সামলে বললো, 'তুমি এমন বলো মা। ভয়ে আবার পেট ভরে যায় নাকি ?'

'যায় যায়, ওসব বুঝবিনে।' হাস্যময়ী প্রৌঢ়া হেসে আমার দিকে তাকালেন, 'দই মিষ্টিগুলো খেয়ে নাও।'

আমি করুণ চোখে তাঁর দিকে তাকালাম। তারপর পুষির দিকে। পুষি আবার হেসে উঠতে যাচ্ছিল। ওর মা ধমকে উঠলেন, 'এই মুখপুড়ী, হাসিসনে। শুনলে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে।'

মা-মেয়ের হাসি দেখলে নির্ভয় হওয়া উচিত। আসলে ভয়ের থেকে অস্বস্তি বেশি। কিন্তু এত মিষ্টি খেতে পারবো না। বললাম, 'যদি দিতেই চান, একটুখানি দই আর একটা মিষ্টি দিন।'

চক্কোত্তি-ভর্ত্রী বললেন, 'তবে ছাই দে, জোর করে লাভ নেই।'

পুষি মুখে আঁচল চেপে পাথরের বাটি থেকে পাতে খানিকটা দই ঢেলে দিল। দুটো মিষ্টি তুলে দিয়ে বললো, 'একটা দিতে নেই।'

নাতিদীর্ঘ ফরসা পুষি মাতৃমুখী। বয়সটা এখনও অনুমান, চোখে তরুণী। স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির মুখে হাসি লেগেই আছে। মায়ের মতো। বয়সের হিসাবে পুষি বাজে বেশি। হাসির কারণটা নিতান্ত আমার দুর্দশায় যদি না হয়, তবে ঘটনার ফেরে নিশ্চয়। দুটি মিষ্টি দিয়ে যদি তার শান্তি হয়, আমি খেতে পারবো। কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল কর্মনষ্ট দলের কথা। কথাটা শুনে পুষিই বাবাকে সামাল দিয়েছিল। ওকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, কর্মনষ্ট দলটা কী?'

পুষি আবার খিলখিলিয়ে উঠলো। আর তৎক্ষণাৎ ওর মা একেবারে হাত তুলে মারের ভঙ্গি করে ধমক দিলেন, 'চুপ।'

পুষিও চুপ। আসলে চুপ না। মুখে আঁচল ঠেসে চুপ। হাসি এখন শরীরের তরঙ্গে। মুখ লাল। মা যদিও চোখ পাকিয়েছেন, তিনিও ঠোঁটের কোণে হাসি টিপে রেখেছেন। তবু ধমক দিয়ে বললেন, 'নে, থাম। ও যা জিজ্ঞেস করেছে তার জবাব দে।'

তথাপি পুষির হাসির তরঙ্গ থামতে কিঞ্চিৎ সময় লাগলো। জবাবটা না শুনে হাতে মুখে এক করতে পারছি না। পুষি মুখের আঁচল সরিয়ে, গলা খাকারি দিল, 'কর্মনষ্ট হলো কম্যুনিস্ট।'

'কম্যুনিস্ট?' সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে পুষির মুখের দিকে তাকালাম।

পুষি কোনো রকমে রুদ্ধ হাসির বেগ সামলে বললো, 'বাবা কম্যুনিস্ট পার্টিকে বলে কর্মনষ্ট পার্টি।' বলেই মুখে আঁচল চাপা। শরীরে তরঙ্গ।

কলকারখানা থেকে গ্রামে গঞ্জে কমিউনিস্ট উচ্চারণের অনেক বিকৃতি শুনেছি। সেগুলো ইচ্ছাকৃত না। অক্ষমতা। কিন্তু এমন একটি আজব উচ্চারণ শুনি নি। কারণ, এটি অক্ষমতা না। ইচ্ছাকৃত তৈরি। ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ। হাসিও যে সংক্রামক, এই মুহূর্তে অনুভব করলাম। তবু ঢোক গিলে সামলে নিলাম। বললাম, 'একেবারে বুঝতে পারি নি।'

পুষি হাসি সামলাতে না পারার ভয়ে, প্রায় দৌড়ে চলে গেল। চক্কোত্তি-ভর্ত্রীও নিজেকে সামলাবার জন্য একটু সময় নিলেন, 'আমার মেজো ছেলে ওই দল করে। বাপ ছেলেতে রোজ এই নিয়ে খিটিমিটি। ছেলে গলায় পৈতে টেতে রাখে না, কোনো কিছু মানতে চায় না। তোমাকেও তাই ভেবেছে।'

আমার শব্দের ভাণ্ডার বাড়লো কী না, জানিনা। বিদ্বেষের ভাষা কেমন ডিগবাজী খায়, সেটা জানা গেল। কম্যুনিস্টকে কর্মনষ্ট করা সহজ কথা না। হাস্যকরও বটে। তবে দলের কথা আলাদা। সেখানে ভ্রান্তি বিদ্রোহের প্রতিবাদ। আমি সমাজের মুখে প্রতিবাদের মুষ্টি তুলে, কাঁধে চালি নিই নি।

সাধ করেও নিই নি। অনিচ্ছা আর দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যেই, আমার ভিতর থেকে কে যেন ঝাঁকি দিয়ে কাঁধটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। বলতে গেলে নিজের সঙ্গে মন জানা-জানি নেই। কাঁধটা যে বাড়িয়ে দিয়েছিল, তাকে পুরোপুরি চিনি না। সে কথাটা চক্কোত্তিমশাইকে বোঝাতে যাওয়ার অর্থ, আর এক ঝকমারি। তিনি যদি তাঁর মধ্যম সন্তানের মতো আমাকে কর্মনষ্ট ভেবে থাকেন, তাই ভাবুন।

খাওয়া শেষ। জলের গেলাসে চুমুক দিয়ে মনে হলো, শরীরের ওজন বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু ওঠবার আগে ঠেক। গোরা চক্কোত্তিমশাইয়ের গৃহ বলে কথা! আমি ভর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এঁটো থালাবাটিগুলো—।'

'কী করবে?' হতচকিত বিস্ময়ে চক্কোত্তি-গৃহিণীর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠলো, 'তুমি এঁটো থালা তুলবে? ওরে ও পুষি, শোন এসে।'

দালানের পূর্ব প্রান্তে পুষি আর ছোটবউ উভয়ে দেখা দিল। গৃহিণীকে তখন হাসিতে পেয়েছে। কোনো রকমে সামলে বললেন, 'জিজ্ঞেস করছে, এঁটো থালাবাসনের কী হবে?' বলতে বলতে মুখে আঁচল চাপা দিলেন।

পূবপ্রান্তেও মুখে আঁচল চাপা হাসি। কিন্তু চক্কোত্তিমশাইয়ের ঘাটের কথা তো হাস্যময়ীদের জানা নেই। কায়স্থ সন্তানকে বাড়ি আনতেই তিনি আপত্তি করেছিলেন। এঁটো পাত ছেড়ে উঠে, আবার কোন মারমূর্তির মুখোমুখি হতে হবে, কে জানে। সঙ্গত কারণেই কথাটা মনে এসেছে।

পুষি এগিয়ে এলো। মুখের হাসিটা ঈষৎ গাম্ভীর্যে ঢাকা, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এঁটো পাড়বার লোক নেই ভেবেছেন নাকি?'

কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'না, তা ভাবি নি, তবে—।'

'কোনো তবে টবে নয়।' পুষি ঝংকার দিয়ে উঠলো, 'উঠুন। আসুন. বাইরের রকে, হাত ধোবেন আসুন।'

ওঁ শান্তি। বড় স্বস্তি পেলাম। পথে ঘাটে যাই করি, গৃহস্থের বাড়িতে খেয়ে, এঁটো বাসন কোনো দিন তুলতে হয় নি। আখড়া আশ্রমে কলাপাতার এঁটো পাড়া এক কথা। গৃহস্থের বাড়িতে আর এক কথা। মনে করি, পথে বেরিয়ে ফেলে এসেছি সব কিছু। ওটা মনের সান্ত্বনা। আসলে নিজের সমাজ পরিবারের মন আর চরিত্রটা ভিতর কপাটে ঘাপটি মেরে বসে আছে। সময় হলেই সজাগ হয়ে ওঠে। স্বস্তিটা সেই কারণে। আর মনে মনে কৃতজ্ঞতা এই মহিলাদের কাছে।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। পুষি উত্তরের রকে যাবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলো, 'এদিকে আসুন।'

রকে গিয়ে দেখলাম, জলভরা বালতি আর ঘটি রয়েছে। আমি ঘটিতে হাত দেবার আগেই, পুষি ঘটি তুলে বালতিতে ডোবালো, 'নিন, হাত বাড়ান, জল দিচ্ছি।'

'আপনি দেবেন কেন, আমিই নিচ্ছি।' ঘটির দিকে হাত বাড়ালাম।

পুষির কালো চোখে অবাক ভ্রূকুটি। খোলা ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে দাঁত, 'আমাকে আপনি করে বলছেন?'

তারপরেই খিলখিল হাসি। ওর হাতের ঘটি থেকে ছলকে জল পড়তে লাগলো।

'কী হলো?' গিন্নী এসে দরজায় দাঁড়ালেন।

পুষি হাসি সামলে বললো, 'উনি আমাকে আপনি আজ্ঞে করছেন!'

'বোধ হয় তোর বাবার ভয়ে।' বলে হেসে উঠলেন।

কতোক্ষণেরই বা পরিচয়। যথার্থ পরিচয় বলা যায় না। যদিও আচরণে আর হাসির বাজনায়, প্রাণে আমার সহজের তাল লেগেছে। কিন্তু এত সহজে একজন তরুণীকে আপনি ছাড়া কী বলা যায়। বয়সটা যাই হোক। মেয়েরা শাড়ি পরলেই রাতারাতি বড় হয়ে ওঠে।

পুষি মায়ের কথা শুনে আবার খিলখিল হাসির মুখে আঁচল চাপলো। তরুণী অঙ্গে তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

গৃহিণী বললেন, 'নে, আর হাসিসনে। জল দে।'

'ওসব আপনি টাপনি বলবেন না, বুঝলেন?' পুষি মুখের আঁচল সরিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো।

'আমার নাম ভারতী। নিন, হাত ধোন।' ও আবার বালতিতে ঘটি ডুবিয়ে জল নিল।

হাত মুখ ধুতে ধুতে ভাবলাম, চলে যাবার সময় হলো। সম্বোধনের অবকাশই বা কোথায়। কিন্তু সে-কথা তোলা নিরর্থক। হাত মুখ ধুয়ে, পকেট থেকে রুমাল বের করলাম।

'আমাদের তোয়ালে টোয়ালে নেই, গামছা চান তো দিতে পারি।' পুষি বললো।

বললাম, 'রুমালেই হয়ে যাবে। ভেজা জামাকাপড়ের সঙ্গে আমারও গামছা আছে।'

'জানি।' পুষি ঘাড় ঝাঁকালো। শাড়ির আঁচল দেখিয়ে বললো, 'আর আঁচল চান তো, তাও দিতে পারি।'

আমি অবাক সন্দিগ্ধ চোখে পুষির চোখের দিকে তাকালাম। পরিহাস? পুষির মুখে লাল ছটা লেগে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে রকের পুব দিকে চলে গেল। লজ্জা পেয়েছে বোঝা গেল। পরিহাস যদি না হয়, তবে উচ্ছ্বাসের ঢেউ ওকে লজ্জার স্রোতে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

আমি দালানের ভিতরে গেলাম। পাতের আসনের দুপাশে আমার শাল আর কাঁধের ঝোলা। গৃহিণী দাঁড়িয়ে ছিলেন সামনের ঘরের দরজায়। আমি শাল আর ঝোলা তুলে নিলাম। এবার জামাকাপড়গুলো পেলেই বিদায় নিতে পারি। গৃহিণী বাঁ হাতে পাশের ঘর দেখিয়ে বললেন, 'ও ঘরে যাও।'

আবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে? বললাম, 'রাগ করবেন না?'

'করলেই বা কী? গিয়েই দেখ না।' গৃহিণী হেসে বললেন।

আমি তাঁর চোখের দিকে একবার দেখলাম। তাঁর প্রৌঢ় চোখে এখনও উজ্জ্বলতা, হাসিতে বরাভয়। অতএব, মাভৈঃ। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়ালাম। বড় ঘর, পুরনো মেঝে। গোটা বাড়ির চেহারাটাই একরকম। বয়স নিশ্চয় শতবর্ষ অতিক্রান্ত। পুবের দিকে জানালা দরজা সবই খোলা। একটি জানালার কাছে মাদুর পাতা। চক্কোত্তিমশাই মাদুরের ওপর বসে এখনও বিড়ি টানছেন। প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন, মুখ দেখে বোঝা শক্ত, একটু যেন উদাস গম্ভীর। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এস।'

ঘরের ভিতরে পা দিলাম। চক্কোত্তিমশাই মাদুরের একপাশ দেখিয়ে বললেন, 'বস। পেট ভরেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।'

বলছেন যখন বসতেই হবে। এলাম, খেলাম, চলে গেলাম, সেটাই বা হয় কেমন করে। আসলে ভয়। মাদুরের ওপর শাল ঝোলা রেখে বসলাম। ঘরে তেমন আসবাবপত্র কিছুই নেই। দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে সাবেক-কালের উঁচু আর দশাসয়ী খাটের ওপর বিছানার চেহারা দীর্ণ। দুটো দেওয়াল-আলমারির কাঠের পাল্লা বন্ধ। দেওয়ালের গায়ে গোটা কয়েক পুরনো ফটো টাঙানো। পুবের খোলা দরজা জানালা দিয়ে দেখছি, উঠোন না, দক্ষিণের বাগান। পেয়ারা বেল নিম আর লেবু গাছ। বেল জুঁই জবা ফুলের গাছ ছাড়াও অপরাজিতার ঝাড় উঠেছে দক্ষিণের সীমানার পাঁচিল ঘিরে। এক পাশে গোটা কয়েক বেগুন আর বিলিতি বেগুনের গাছ। খোলা জায়গায় মাটি দেখলে বোঝা যায়, আরও কিছু শীতের সবজি ছিল। পুব সীমানায় এই ঘরের মুখোমুখি আর একটি ঘর। একতলা বাড়ির আকার বেশ বড়। বাগানে শেষবেলার রোদ। বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা তারে আমার জামাকাপড়গুলো ঝুলছে। তার সঙ্গে বাড়িরও কিছু।

'আমি ওখান থেকে উঠে না এলে তোমার খাওয়া হতো না।' চক্কোত্তিমশাই বিড়িতে টান দিয়ে বললেন।

আমি অস্বস্তি বোধ করলাম, না ভেবেই কিছু বলতে গেলাম। উনি হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন, 'তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমি বুঝি। সংসারে যার যেমন ইচ্ছে তেমনি চলবে, আমার কথায় কী আসে যায়। নিজের ছেলেই কথা শোনে না।' কতকটা যেন নিজের মনেই বলে চলেছেন। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিড়িতে টান দিলেন, 'দিনকাল বদলাচ্ছে। রক্ষে, সব কিছু দেখবার জন্য চিরকাল বেঁচে থাকতে হবে না। তবে শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম, অন্যায় কিছু করো নি। মড়া মানুষ, সবই সমান। বেশ্যা হোক আর

গেরস্থের বউ হোক। মড়া বয়ে তো সংসারের কারো ক্ষতি করো নি। তোমার বাপ-মা বেঁচে আছে?'

চক্কোত্তিমশাইয়ের মুখ শান্ত, স্বর উদাস। চিনতে ভুল হচ্ছে। বললাম, 'বাবা মারা গেছেন, মা আছেন।'

'তোমার মা শুনলে কী ভাববে?' চক্কোত্তিমশাই আমার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলেন।

আমার চোখের সামনে মায়ের মুখ ভেসে উঠলো। বিধবা, বৃদ্ধা, সংসারের প্রতি অনেকটা নিরাসক্ত। কিন্তু মুখের স্নিগ্ধ হাসি বিলুপ্ত হয় নি। জীবনের অতীতের গল্প বলতে ভালোবাসেন। বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যান। শান্ত মুখে তাঁর স্বামীর ছবির দিকে তাকান। তবু জানি, বেশ্যার শব বহনের কথা মাকে বলতে পারবো না। শুধু কষ্ট পাবেন না, যে সংসারের প্রতি তিনি এখন নিরাসক্ত সেই সংসারের অকল্যাণের শঙ্কায় তাঁর প্রাণ কেঁপে উঠবে। বললাম, 'মাকে বলতে পারবো না।'

আমাকে চমকে দিয়ে চক্কোত্তিমশাই মোটা কাঁসরের ঢং ঢং শব্দে হেসে উঠলেন। সে-হাসি সহজে আর থামতে চায় না। বললেন, 'সংসারের কী মজা, অ্যাঁ?'

এই সময়ে পুষি এলো ঘরে। ওর ডান হাতে ছোট একটা পেতলের রেকাবি। বাঁ হাত পিছনে। দু চোখ ভরা বিস্ময়। আমাকে আর ওর বাবাকে দেখলো কয়েক মুহূর্ত। চক্কোত্তিমশায় মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'পান এনেছিস? দে।'

পুষি এগিয়ে এসে আমাদের সামনে রেকাবি রাখলো। এক খিলি পান, পাশে ছ্যাঁচা পানের ছোট একটি দলা। জিজ্ঞেস করলো, 'হাসছো কেন বাবা?'

'হাসির কথা শুনে।' চক্কোত্তিমশাই হাত বাড়িয়ে ছ্যাঁচা পানটুকু তুলে মুখে পুরে দিলেন, 'তুই যেন কী একটা দেখাবি বলেছিলি?'

পুষি আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ। আপনি পান নিন।'

খাবার পরে আসল নেশাটা রক্তে দাপাচ্ছে। ধূমপান। চক্কোত্তিমশাইয়ের সামনে সাহস পাচ্ছি না। কিন্তু পান চিবোতে পারি না। বললাম, 'ওটা চলে না।'

'খাবার পরে একটা পান চিবনো ভালো।' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'ইচ্ছে না করলে খেও না।'

তারপরেই হঠাৎ যেন তাঁর বিষম লাগলো। গলায় একটা শব্দ করে বললেন, 'এই দেখ, ভুলেই গেছি। মাকে বলতে পারবে না শুনে তো খুব হেসে নিলাম। কিন্তু ঘাটের ক্ষ্যাপাবাবা বলছিল, তুমি নাকি ধর্মাত্মা।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ক্ষ্যাপা বাবাটা কে?'

'ঐ যে হে, নৌকায় বসে হারমোনিয়াম- বাজাচ্ছিল।' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'সবাই বলে ক্ষ্যাপাবাবা, নাম বোধহয় শ্যামানন্দ। নৌকার গায়ে লেখা আছে শ্যামাক্ষ্যাপা। আমাকে বললে, এখানে বসে সব দেখলাম। ছেলেটা ধর্মাত্মা, ওকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। ঘাটে যখন যাবে, একবার দেখা করো।'

শ্যামাক্ষ্যাপা কি ক্ষ্যাপাবাবা, জানি না। স্নান করতে গিয়ে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছিল। চোখ ঘুরিয়ে, ভুরু নাচিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়েছিলেন। তখন আমাকে একটি কথাও বলেননি। কিন্তু বাজনা থামিয়ে চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলাম। কিসের ক্ষ্যাপা, কেন ক্ষ্যাপা কে জানে। তবে বাবাজীর বাজনা চমৎকার। জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি কি নৌকাতেই থাকেন নাকি।

'শোন কথা।' চক্কোত্তিমশাই পুষির দিকে তাকালেন, 'বারোমাস কেউ নৌকায় থাকে নাকি?'

পুষি মুখে হাত চাপা দিল। চক্কোত্তিমশাই আবার বললেন, 'বর্ষা বাদলার সময় ছাড়া শ্যামাক্ষ্যাপা প্রত্যেক মাসেই পূর্ণিমার দিন ত্রিবেণীতে আসে। কয়েকদিন থাকে, আবার চলে যায়। গুপ্তিপাড়া না কালনা, কোথায় নাকি আশ্রম আছে। এবারের মাঘী পূর্ণিমায় এসেছে, এখনও আছে। আমাকে বললে, তুমি নাকি ধর্মাত্মা। বলেছে যখন, একবার দেখা করো।'

'সত্যি তোমাকে ও কথা বলেছে বাবা?' পুষি অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

চক্কোত্তিমশাইয়ের চোয়াল নড়ছে। অবিশ্যি মুখে এখন পান। বললেন, 'তুই কি ভাবছিস, আমি মিছে বলছি? ওর গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেবার জন্য ঘাটে নেমেছিলাম, তখন আমাকে বললে। কী দেখেছে, কী মনে হয়েছে ক্ষ্যাপার, কে জানে।'

'আপনি তাহলে ধর্মাত্মা!' পুষি ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের কোণে তাকালো! ঠোঁটের কোণে টেপা হাসে।

আমি বললাম, 'কথাটার মানে কী, কী দেখে বলেছেন, কিছুই জানি নে। তবে ভদ্রলোক হারমোনিয়াম ভালো বাজান, এটা শুনেছি।'

'আপনি ধর্মাত্মা মানেও জানেন না?' পুষি একইভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। জবাবের প্রত্যাশা না করেই চক্কোত্তিমশাইয়ের দিকে ফিরে বললো, 'ওঁকে তুমি শ্যামাক্ষ্যাপার কাছে যেতে বলছো বাবা?'

চক্কোত্তিমশাই বিড়িতে টান দিলেন। ধোঁয়া বেরোলো না। বললেন, 'না যাবার কী আছে? দেখা করতে বলেছে, দেখা করবে। তারপরে ওর ভালো মন্দ ও বুঝবে।'

পিতৃদেব ও কন্যার কথার মধ্যে কেমন একটা রহস্যের আভাস। চক্কোত্তি-

মশাইয়ের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পুষির মুখের দিকে তাকালাম। পুষি যেন উদ্বেগে বললো, 'দেখবেন, সাবধান! ক্ষ্যাপাবাবা অনেক তুক-তাক জানে।' হাত তুলে নিজের গলায় কোপ দেবার ভঙ্গি করলো।

আমি হেসে বললাম, 'বলি দেবেন নাকি?'

'বলা যায় না।' পুষি ঠোঁট টিপলো, 'বলি না দিক, ভেড়া বানিয়ে রাখতে পারে।'

চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'আহ্, কী যা তা বলছিস। কয়েক বছর দেখছি, এখনো তো কেউ খারাপ কিছু বলেনি।'

পুষির ঠোঁটে আবার আঁচল চাপা। শরীরে তরঙ্গ। কিন্তু হঠাৎ এমন সাবধানবাণী কেন? পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখা হতো নাকি কামাখ্যা পাহাড়ে। কোন্‌কালে, তা জানি না। কামাখ্যার রমণীরা নাকি ভেড়া বানাবার মন্ত্রগুপ্তি জানতো। কিংবদন্তীর দেশে, গল্পের শেষ নেই। কামাখ্যা কামরূপ ঘুরে এসেছি। ভেড়া হয়ে ফিরি নি। তবে তন্ত্রমন্ত্রের তীর্থ, কোনো সন্দেহ নেই। কিংবদন্তীর সৃষ্টি বোধহয় একেবারে নিছক কল্পনা না। কারণ, দুই চার বালিকাকে দেখেছিলাম, পয়সার জন্য পিছনে লেগেছিল। ওদের পুরো দাবী মেটাতে পারিনি বলে, চোখ ঘুরিয়ে বিড় বিড় করে হাতের আর পায়ের আঙুল মটকেছিল। সেটাই ভেড়া বানাবার তুক কী না জানি না। প্রাণভরে হেসেছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘাটের ওই ক্ষ্যাপাবাবা শাক্ত না শৈব?'

'ও সব জানি নে। শুনেছি আশ্রমে কালী মন্দির আছে।' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'গোখরো কেউটে ময়াল, অনেক সাপ নাকি আছে। শুনেছি, শ্যামাক্ষ্যাপা সাপ গলায় জড়িয়ে বসে থাকে। তবে মন্দিরে বলি হয় না। সবই শোনা কথা। দেখেশুনে মনে হয়, আশ্রমের পসার ভালো। অনেক বড়লোক শিষ্য সামন্ত আছে নিশ্চয়।'

পুষি বললো, 'অনেক সুন্দরী মেয়েও আছে।'

পুষির কথা শুনে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো নৌকার সেই ছবি। উপরের ছইয়ের গায়ে হেলান দেওয়া রমণী মূর্তি। চলে আসবার আগে সে মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখছিল।

'অনেক আছে, তোকে কে বললে?' চক্কোত্তিমশাই ধমকের সুরে বললেন, 'সঙ্গে যাদের নিয়ে আসে, তারা তো বরাবরই আসে। তবে শুনেছি, আশ্রমে অনেক পুষ্যি আছে। তা সে যাই থাকুক, তোমাকে দেখা করতে বলেছে, একবার দেখা করবে। কার মধ্যে কী আছে, বলা তো যায় না। হতে পারে, লোকটার সিদ্ধিলাভ ঘটেছে।'

জীবনে কিছু সাধক দেখেছি। তাঁদের সাধনকর্মও দেখেছি। গুপ্ত মুক্ত সব রকমেরই। কিন্তু সেই সাধনবলে কেমন করে সিদ্ধিলাভ ঘটে বুঝি না।

সিদ্ধপুরুষ কেমন করে হয়, তাও জানি না। সাধক নই। জানবোই বা কেমন করে। যাঁদের তত্ত্ব, তাঁদের তত্ত্ব। আমি দর্শক মাত্র। অতি মানবের বা মানবীর ভড়ং যাঁদের নেই, এমন কিছু সাধক সাধিকার সঙ্গে কথা বলে ভালো লেগেছে। তাঁরা কেউ মন্ত্রের ম্যাজিক দেখাননি। সংসারের বাইরে থেকেও সংসারের সহজ কথাই শুনিয়েছেন।

'কই রে পুষি, তুই যে কী দেখাবি বলছিলি?' চক্কোত্তিমশাই কন্যার দিকে তাকালেন। এই সময়ে গৃহিণীও ঘরে এসে ঢুকলেন। পুষির পিছনের হাত সামনে এলো। হাতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। কয়েকটা পাতা খুলে আমার আর চক্কোত্তিমশাইয়ের সামনে রাখলো। আমি অবাক চোখে পুষির দিকে তাকালাম। পুষিও তাকিয়ে ছিল। ওর চোখের ঝিলিকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা, ঠোঁটে টেপা হাসি। এ দেখছি, ইঁদুর ধরার কল! বড় বিব্রত বোধ করলাম। চক্কোত্তিমশাইয়ের চোখে চশমা নেই। পত্রিকাটি চোখের সামনে তুলে নিয়ে দেখলেন। এখনও কি চশমা ছাড়া পড়তে পারেন? বললেন, 'হুঁম, নামটা তো একই দেখছি। কিন্তু সত্যি নাকি হে? এই ছাপা নামটা কি তোমার?' তিনি পত্রিকার খোলা পাতাটা আমার সামনে মেলে ধরলেন। তাকালেন মুখের দিকে।

বড় অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। পত্রিকার দিকে আমার চেয়ে দেখবার দরকার ছিল না। পুষির দিকে তাকালাম। এখন ওর চোখের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসায় ব্যগ্র জিজ্ঞাসা। অনুমান আর কীর্তিটা ওরই, কোনো সন্দেহ নেই। একবার দেখলাম চক্কোত্তি-ভর্ত্রীর দিকে। তাঁর চোখেও অবাক জিজ্ঞাসা। বিষয়টিতে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু স্বধর্মী মাত্র বুঝতে পারেন, কুণ্ঠাটা কোথায়। 'না' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। উড়িয়ে দিয়েও পার পাওয়া যাবে কী না জানি না। সেটা ভাবতেই কেমন মনে অপরাধ বোধ জাগছে। বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কী বলেছিলাম মা তোমাকে!' পুষি প্রায় এক লাফে সরে গিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

আমি দেখলাম, ওর ফরসা মুখের হাসিটি বালিকার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বালিকার মতোই খুশিতে বেজে উঠলো, 'বাবা, ঠিক দেখিয়েছি তো?'

চক্কোত্তিমশাই আমার মুখের দিকেই তাকিয়েছিলেন। আওয়াজ দিলেন, 'হুঁম, ঠিক দেখিয়েছিস। তা, তুমি কোনো চাকরি-বাকরি কর, না এ সবই কর?'

বললাম, 'হ্যাঁ—মানে, এ সবই করি।'

'এ সব করে চলে?' চক্কোত্তিমশাইয়ের জিজ্ঞাসা।

পুষির ঝাপটা, 'ধ্যুৎ, বাবা যে কী সব বলে না? দেখছো তো মা?'

গৃহিণীর হাসিতে মুগ্ধতা। চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'আহা, এটাও জিজ্ঞেস করতে হয়। তা যাক, এ সব কী লেখা? ধর্মের কথা-টথা কিছু আছে, না গাল গপ্পো?'

'আহ্, বাবা, তুমি যে কী বল, তার ঠিক নেই। উনি একজন লেখক।'

চক্কোত্তিমশাই অবাক স্বরে বললেন, 'সেই জন্যেই তো জিজ্ঞেস করছি, কী লেখে? লেখা তো অনেক রকম আছে। না, কী বলো হে?'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ। ওই আপনি যা বলেছেন, গাল গপ্পোই লিখি।'

'বাবা, একদম বিশ্বাস করো না।' পুষি আমাকে চোখ পাকিয়ে হাসলো, 'কোন দিন দেখবে, তোমাকে নিয়ে কোথায় কী লিখে দিয়েছেন।'

চক্কোত্তিমশাইয়ের ফোগলা মুখের হাসিটি, ছ্যাঁচা পানে লাল। এইটি হিসাবে তৃতীয় হাসি। বললেন, 'আমাকে নিয়ে আর কী লিখবে? কুচ্ছো করবে, গুচ্ছের গালাগাল দেবে, এই তো?'

'ছি ছি, এ কি বলছেন?' আমি ব্যস্ত বিব্রত হয়ে বললাম, 'যাই লিখি, আমি অকৃতজ্ঞ নই।'

চক্কোত্তিমশাই মাথা ঝাঁকালেন, 'কিন্তু ঘাটে যখন নিজে গঙ্গাজল এনে তোমার গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, তখন তুমি আমাকে একটা পেন্নামও করোনি।'

আহ্, অই হে! কার যে কোথায় বাজে। আমার খেয়াল হয়নি। ধারণাও ছিল না। তেমন কোনো সূর্যবংশীয় প্রতিজ্ঞাও আমার নেই। মহাশয়ের প্রাণে লেগেছে বলেই কথাটা মনে রেখেছেন।

আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাঁর দু-পা ছুঁয়ে কপালে ঠেকালাম। তিনি শশব্যস্ত হয়ে আমার মাথায় হাত দিলেন, 'আহা, থাক থাক, জয়স্তু।'

পুষি খিলখিল করে হেসে উঠলো। গৃহিণী অকারণেই ঘোমটাটা একটু টানলেন। তাঁর মুখেও হাসি। কিন্তু চোখ দুটো ভিজে উঠছে নাকি? বললেন, 'কোথা থেকে কী ঘটে যায়, কেউ বলতে পারে না।'

'আর বাবা কেমন পেন্নামটা আদায় করলে দেখ!' পুষি হাসতে হাসতে বললো।

চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'তুই ভাবছিস আদায়। কিন্তু ওর এ সব জানা দরকার। না, কী বলো হে? তবে আমার মেয়ে বড় সজাগ। তোমার নামটা শুনেই লাফিয়ে উঠেছিল। তোমাকে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেও এসেছিল। আমাকে বললে, ভদ্রলোকের খাওয়া হয়ে গেলে তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো। আমি ভাবি—।'

'থাক, ও সব আর বলতে হবে না।' পুষি বাধা দিয়ে বললো। মুখে ওর লজ্জার ছটা, কিন্তু এখনও একটা উত্তেজনার ঝলক, 'আমি মনে মনে ভগবানকে ডাকছিলাম, যা ভেবেছি, তাই যেন মিলে যায়।'

পিতার গর্ব পুত্রীকে নিয়ে। পুত্রী খুশিতে আটখানা। চক্কোত্তিমশাই একটু নড়েচড়ে বসলেন, 'কিন্তু তুমি তো আমাকে অবাক করলে হে। তুমি একটা লেখক মানুষ, ওদের মড়া বয়ে আনলে?'

কী জবাব দিতাম জানি না। তার আগেই পুষি বলে উঠলো, 'তা নইলে যে আমাদের বাড়ি আসা হতো না।'

গৃহিণী হেসে উঠলেন, 'যা বলেছিস।'

কর্তা গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে হাস্য করলেন। চতুর্থ হাসি। বললেন, 'তোমারই মেয়ের মুখে কথা যুগিয়েই আছে। মানছি, এ হলো দৈবের যোগাযোগ। কিন্তু কথা হচ্ছে, ও একটা লেখক মানুষ। রাস্তায় ওকে যারা ডাকবে, তাদেরই মড়া বইবে?'

'তা কেন?' আমি বললাম, 'সবাই তো আর ডাকাডাকি করে না। ধরে নিন, এটাও দৈব।'

চক্কোত্তিমশাইয়ের পঞ্চম হাসি, মোটা কাঁসরে ঢং ঢং বেজে উঠলো, 'এর ওপরে আর কথা চলে না। কিন্তু বংকারা যখন জানবে তখন কী হবে বল দিকিনি?'

আমি আঁতকে উঠে বললাম, 'বংকারা কেন জানবে? কী করে জানবে?'

পিতা মাতা কন্যা, তিনজনেরই দৃষ্টি আমার দিকে। অস্বস্তিতে বললাম, 'এই জানাজানির ব্যাপারটা আপনাদের মধ্যেই থাক। ওদের জানাবার দরকারই বা কী?'

'উনি ঠিকই বলেছেন বাবা।' পুষি বললো, 'ওদের জেনেই বা কী লাভ? আমরা ছাড়া আর কেউ জানবে না।'

চক্কোত্তিমশাই মাথা ঝাঁকালেন, 'ভালো কথা। কিন্তু তোর দাদারা যখন জানবে, তখন কি আর কারো জানতে বাকি থাকবে?'

'দাদাদের আমি বলে দেবো।' পুষি বললো, 'কাদের বলবে আর কাদের বলবে না, সেটা ওরা বুঝবে।'

'আর তুই তো কলেজে গিয়েই সব মেয়েদের ডেকে ডেকে আগে বলবি।' চক্কোত্তিমশাই গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা পিট পিট করলেন।

পুষির চোখ আমার দিকে। লজ্জার ছটায় মুখ লাল। একটু ঝেঁজে বললো, 'হ্যাঁ, তোমাকে বলেছে, আমি কলেজে গিয়েই মেয়েদের বলবো। দেখছো তো মা?'

পুষি যে কলেজে পড়ে, ওকে দেখে বোঝা যায় না। মা বললেন 'তোর বাবার কথাই ও রকম।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ কলেজ ?'

পুষির চোখে মুখে লজ্জার ছটা গাঢ়তর হলো, 'হুগলির উইমেন্স-এ, ফার্স্ট ইয়ার।'

বয়সটা তা হলে একেবারে ভুল করিনি। ষোল সতেরো থেকে দু এক বছর বেশি। তারপরেও বলে কী না, ওকে কেন আপনি করে বলবো। নেহাত চেনা বলে, এই কথা। পথের অচেনায় তুমি বললেই, তখন আর এক রূপ দেখতে হতো।

আমি হেসে বললাম, 'এটা কোনো গোপন রহস্যের ব্যাপার নয়। আমার পরিচয়টা জানলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কেমন একটা অস্বস্তি হয়, তাই কথাটা বললাম। পথে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, এই যা। এ বাড়িতে না এলে এতক্ষণে ত্রিবেণী ছেড়ে আমি হয়তো চলেই যেতাম।'

'ইস্, একেবারে নাকের ডগা দিয়ে চলে যেতেন।' পুষির চোখে উদ্বেগ, মুখে হাসি, 'ভাগ্যিস আপনাকে খাওয়াবার জন্য আমাদের বাড়ির কথাটাই ওদের মনে এসেছিল।'

চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, আসল কথাটাই জানা হলো না। ত্রিবেণীতে তুমি কোথায় এসেছিলে ? বংকার কাছে শুনেছি, ওরা তোমাকে মসজিদের কাছে ধরেছিল। বাসে করে এসেছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'কলকাতা থেকে বাসে বাসে ? না কি ট্রেনে চুঁচড়োয় নেমে বাস ধরেছ ?'

চক্কোত্তিমশাই ধরেই নিয়েছেন, আমি কলকাতা থেকে আসছি। ভুল ভাঙাবার দরকারই বা কী ? মিথ্যা না বললেই হলো। বললাম, 'চুঁচড়ো থেকে বাসে এসেছি। ত্রিবেণীতে এসেছি ত্রিবেণী দেখতেই, অন্য কোথাও নয়।'

'শোন্ পুষি, ত্রিবেণী দেখতেও লোক আসে।' চক্কোত্তিমশাইয়ের ষষ্ঠ হাসিটা কিঞ্চিৎ বিদ্রূপে বাঁকা।

পুষি বললো, 'কেন, আমাদের ত্রিবেণী কি ফ্যাল্‌না জায়গা ?'

'না, তা কেন হবে ?' চক্কোত্তিমশাই জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন, 'বারুণি মকর সংক্রান্তি মাঘী পূর্ণিমায় লোকে আসে পুণ্যি করতে। এর সে-বালাই আছে বলে মনে হয় না। তবে মহাশ্মশানটা তো দেখা হলো। ওটাই এখন আসল ত্রিবেণী।' আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা, এখান থেকেই ফিরে যাবে, না অন্য কোথাও যাবে ?'

আগের মিথ্যা কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'ভাবছি, এখান থেকে নবদ্বীপে যাবো।'

'নবদ্বীপ ?' চক্কোত্তিমশাই গৃহিণী আর কন্যার দিকে একবার দেখলেন। তাঁর লোমহীন ভুরুতে গাঢ় ত্রিকোণ, চোখে বিস্ময়, 'সেখানে কি কারোর বাড়িতে, না বেড়াতে ?'

বললাম, 'বেড়াতেই।'

চক্কোত্তিমশাইয়ের মুখের ভাঁজে, চোখের তারায় বিস্ময় বাড়তেই থাকে, 'রাত্রে কোথায় থাকবে ?'

বললাম, 'ঠিক করিনি কিছু। হোটেল টোটেল আছে নিশ্চয়।'

চক্কোত্তিমশাই আবার গৃহিণী ও কন্যার দিকে দেখলেন, 'তোমার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে ?'

কব্জি তুলে বললাম, 'সাড়ে তিনটে।'

'গাড়ি একটা আছে।' চক্কোত্তিমশাইয়ের চোয়াল নড়ছে, 'সময়ও আছে ঘণ্টা দেড়েক। কিন্তু নবদ্বীপে কখনো গেছ ?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

'তা হলে ?' চক্কোত্তিমশাইয়ের দৃষ্টি আবার গৃহিণী ও কন্যার দিকে, 'পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে। অচেনা জায়গা। কোথায় যেতে কোথায় যাবে।'

গৃহিণী এবার আওয়াজ দিলেন, 'তার চেয়ে আজকের রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাও না।'

যাবার এবং সময়ের কথা উঠতেই, আমার ভিতরে ব্যস্ততায় ঘোড়দৌড় লেগেছে। বাগানে তাকিয়ে দেখছি, দ্রুত বিলীয়মান বেলা রক্তিম হয়ে উঠছে। দোয়েল পাখির যা চরিত্র, এখন থেকেই জোড়ের পাখিটিকে ডাকতে আরম্ভ করেছে। পুষির সঙ্গে চোখাচোখি হলো। ওর ব্যগ্র চোখের ভাষা পড়তে অসুবিধা হয় না। এখানে কাটিয়ে যাওয়া মানে, এ বাড়িতে থেকে যাওয়া। চক্কোত্তিমশাইয়ের দৃষ্টিও আমার দিকে। আমি বললাম, 'একলা মানুষ, আশ্রয় একটা জুটে যাবেই। সেরকম বুঝলে, ফিরেও যেতে পারি। ও নিয়ে ভাববেন না। আমি বরং এবার উঠি।'

আসলে চন্দ্রাবলীর চালি কাঁধে চেপে, আমার সবই গোলমাল করে দিয়েছে। ত্রিবেণীর ঘাট থেকে অনেক আগেই আমার চলে যাবার কথা। গন্তব্যের কোনো ঠিকানা ছিল না। ভেবেছিলাম মুক্ত বেণীর উজান পথে, যেখানে সন্ধ্যা নামবে, সেখানেই একটা আশ্রয় খুঁজে নেবো। এখন মনে হচ্ছে, ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

'একটা রাত কি এখানে কাটিয়ে যাওয়া যায় না ?' পুষির মুখে ছায়া, চোখে বিষাদ।

পুষির হাসি খিলখিল, মুখে আঁচল চাপা তরঙ্গটাই ভালো লাগে। মুখের ছায়ায় চোখের বিষাদে কেবল একটা রুদ্ধ পথের গম্ভীর দাগ পড়ে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'যদি ত্রিবেণীতেই থাকতে হয়, তবে এখানেই ফিরে আসবো।'

পুষির চোখের বিষাদে অবিশ্বাসের ছায়া। ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও ঝিলিক দিল, 'আপনাকে তো মিথ্যেবাদী বলতে পারি নে।'

কথাটা চমক লাগিয়ে দিল। ভুলে যাচ্ছি, পুষি ওরফে ভারতী চক্রবর্তী কলেজে পড়ে। ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। সেটাই বোধ হয় আসল কথা না। কলেজে পড়া বুদ্ধির থেকেও, নারী প্রকৃতির চোখের দৃষ্টিতে বোধ হয় অধিক কিছু আছে। গৃহিণী বললেন, 'ও রকম বলিস নে। মিথ্যে কথা বলবে কেন?'

'আমিও তো সে কথাই বলছি, উনি তো মিথ্যে কথা বলতে পারেন না।' মেঘের কোলে চিকুর হানা হাসি ওর ঠোঁটে।

চক্কোত্তিমশাই উঠে দাঁড়ালেন, 'তা হলে আর দেরি করিস নে পুষি। ওর জামাকাপড়গুলো এখনো শুকোয় নি। ওর ভেজা গামছাতেই ওগুলো জড়িয়ে বেঁধে দে।'

পুষি পুবদিকের খোলা দরজা দিয়ে বাগানে নেমে গেল। আমি গায়ের শাল আর ঝোলা তুলে নিলাম। চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'চলো, বাগানে নেমে সদর দরজা দিয়ে বেরোই।'

'আমার স্যাণ্ডেল জোড়া দোকানে রয়েছে।' পা বাড়াবার আগে পাদুকার কথা ভুলতে পারিনা।

চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'তাও তো বটে। যাও, পায়ে গলিয়ে এসো।'

'স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে ভিতরে আসবো?' আমি দ্বিধার স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'তাতে আর কী হয়েছে। বাড়ির ছেলেরা তো ও সব কিছুই মানে না। তুমি আর বাকি থাকবে কেন। যাও, স্যাণ্ডেল পরে এসো।'

আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ঘরের বাইরে এলেন। আমি দোকানের ভেজানো দরজা খুলে, ভিতরে ঢুকলাম। মহাজন মহাশয় তখন অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে গল্প জুড়েছেন। একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আমি স্যাণ্ডেল পায়ে গলিয়ে, দালানে এলাম। চক্কোত্তিমশাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'দোকানটা কাদের?'

'আমাদেরই বলতে পারো।' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'আমার ছোট ভাইয়ের দোকান। লেখাপড়া যজমানি, কিছুই শেখেনি। বাজার বড় রাস্তা নয়, পাড়ার ভেতরে দোকান। লোকসান ছাড়া কিছু হয় না। তবু একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো। এসো।'

সংকোচ হলেও, স্যাণ্ডেল পায়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। বাগানে দেখছি পুষি ভেজা গামছার পুঁটলি নিয়ে দাঁড়িয়ে। মুখ ফেরানো ওর দক্ষিণে। ডান গালে, লাল পাড় সাদা শাড়ি আর খোলা চুলে শেষ বেলার রোদ। বাগানের দরজায় পা দিতে গিয়ে ঠেক লেগে গেল। ফিরে এসে

গৃহিণীর সামনে নত হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিলাম। তিনি সরে যাবার অবকাশ পেলেন না, ব্যস্ত হয়ে বললেন, হয়েছে হয়েছে। 'ভালো থেকো। আর সত্যি ত্রিবেণীতে থাকলে, চলে এসো।'

আমি ঘাড় কাত করে, চক্কোত্তি মশাইকেও প্রণাম করতে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরে বললেন, 'একবার করেছো, ওতেই আমি খুশি। এসো।'

আমি আর একবার গৃহিণীর দিকে তাকালাম। তাঁর হাসিটিও ছায়ায় ঢাকা। বললাম, 'চলি।'

'এসো।' তিনি দরজার দিকে এগিয়ে এলেন।

'এ যাত্রায় যদি না হয়, একবার শুধু আমাদের বাড়িতেই এসো।'

পথের টানে কোথায় কখন ঠেক লেগে যায়, বলা যায় না। পথ বেছে, দিনক্ষণ ঠিক করে কোনো দিন আসা হবে কী না জানি না। তবু বললাম, 'এদিকে এলে আসব।'

আমি চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে বাগানে নামলাম। দোয়েলটা কোন ঝোপের আড়াল থেকে ডেকেই চলেছে। মাঝে মাঝে বুলবুলির শিস্। পুষি আমাদের আগে আগে চলেছে। গজালপোঁতা দেউড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আমি কাছে গিয়ে, পুঁটলিটা নেবার জন্য হাত বাড়ালাম। চক্কোত্তিমশাই দেউড়ির বাইরে পা বাড়ালেন।

পুষি পুঁটলিটা দেবার আগে বললো, 'এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছিনে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী?'

পুষি হাসলো। সকালে ফোটা বিকালের বাসী ফুলের ছবি। কোনো জবাব না দিয়ে পুঁটলিটা বাড়িয়ে দিল। আমি হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত জবাবের প্রত্যাশা করলাম। ও কিছু বললো না। আমি দেউড়ির চৌকাঠে পা দিলাম।

'আবার যদি কখনো ত্রিবেণীতে আসেন—'

আমি পুষির কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলাম, 'তখন নিশ্চয়ই আসবো।'

'না আসতে বলছিনে। আসতে বারণ করছি।' ও মুখ নামিয়ে নিল।

আমার মুখের হাসিটাই যেন বাতাসের ঝাপটায় থতিয়ে গেল। পুষি আবার মুখ তুললো। হাসির ক্ষীণ রেশ ঠোঁটে। চোখের তারা নিবিড়। কিছু বলতে গিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট টিপলো। তারপরে কোনো রকমে উচ্চারণ করলো, 'সত্যি।' বলেই পিছন ফিরলো।

আমি ওর দিকে তাকালাম। পিঠের খোলা চুলে আর গায়ে দেউড়ির মাথার ছায়া। ও এখন রোদের রক্তাভার আড়ালে। কিছু বলা নিরর্থক। তবু বললাম, 'আসি।' চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়ে, চক্কোত্তিমশাইকে

অনুসরণ করলাম। পোড়ো পেরিয়ে, পুকুর ধার থেকে পাকা রাস্তায় পা দিলাম। একবার ফিরে না তাকিয়ে পারলাম না। পুষি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। দোয়েলটা ডেকেই চলেছে।

ঘাটের সিঁড়ির নিচের ধাপে, জলের গায়ে রোদ চিকচিক করছে। মাঝখানের চরে, চরের ওপারে এখনও রক্তাভ রোদ। ঘাটের ভিড় কমে নি। আশেপাশে বসে আছে কিছু বৃদ্ধ বৃদ্ধার দল। সেই দুপুরের মতোই। এখনও অনেকে স্নান করছে। পাশের পুরনো ঘাটে নোঙর করা নৌকা থেকে মালের বস্তা পিঠে বোঝাই করে ওপরে উঠছে দুই তিন বাহক। শ্যামাক্ষ্যাপা বা ক্ষ্যাপাবাবা, যা-ই হোন, নৌকা তাঁর এক জায়গাতেই নোঙর করে আছে। কিন্তু চোখের ভ্রম না মনের ধন্দ বুঝতে পারছি না। বজরাতুল্য নৌকার দিক বদল হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণের গলুই উত্তরে। উত্তরের গলুই দক্ষিণে।- হারমোনিয়ম মন্দিরা আর বাজছে না। ক্ষ্যাপাবাবা, মন্দিরাবাদক বসে আছেন উত্তর দিকে। তাঁদের কাছে বসে দুই রমণী। একজনকে আগেই দেখেছিলাম। এখন দেখছি আর একজন। দ্বিতীয় রমণী ক্ষ্যাপাবাবার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। সকলের মুখ পুব দিকে। ঘাটের দিকে কারোর নজর নেই। দক্ষিণের গলুইয়ের চওড়া পাটাতনের ওপর, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে চার মাঝি। খাটো ধুতির ওপরে চাদর গায়ে। দুজনের মাথায় শুকনো গামছা জড়ানো। এক পাশে চওড়া টিনের পাতের ওপর কাঠ জ্বালাবার উনোন। কাঁসা পিতলের থালাবাটি ঝকঝকে মাজা। থাকে থাকে সাজানো। পাশেই উপুড় করা পিতলের বড় হাঁড়ির পিছনে লেপে দেওয়া গঙ্গামাটি। এদিকের ছইয়ের মুখ-ছাটেও দুই পাল্লার দরজা। দেখে মনে হচ্ছে ভিতর থেকে বন্ধ।

কিন্তু নৌকার মুখ ঘোরানোর কারণ কী? মুহূর্তেই নিজের ভ্রম ধন্দের মুখে চাঁটি। জলের দিকে তাকিয়ে দেখি, ভাটার টান। দক্ষিণে স্রোতের ঢল। উজান ভাটির মুখ ফেরাফিরি দেখে চোখ পচে গেল। তবুও কী না ধন্দ। মুখ ঘোরাবার দরকার হয় না। আপনিই ঘুরে যায়। মাঝিকে নোঙরের জায়গা বদলাতে হয়।

'চলো তা হলে ওদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসা যাক।' চক্কোত্তিমশাই শ্মশানের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'এটা আমারও দায়। অন্তত বংকার কাছে। নইলে ভাববে, তোমাকে হয়তো আমি বাড়িতে নিয়ে যাই নি।'

চক্কোত্তিমশাইকে আমি ঘাট অবধি আসতে বারণ করেছিলাম। তিনি শোনেননি। বলেছিলেন, 'তা হয় না। যেখান থেকে তোমাকে নিয়ে এসেছি, সেখানে পৌঁছে দেবো।' আসলে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে এসেছেন।

আমি বললাম, 'সে-কথা তো আমিই ওদের জানিয়ে দিতে পারি।'

'তা তো পারোই।' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'তবু একবার দেখা দিয়ে

যাওয়াটা আমার কাজ। তা ছাড়া, একটু দেখে যাই, ওদের দাহকার্যটি কেমন হচ্ছে।'

কেবল দায়িত্ব না, কিঞ্চিৎ ভিন্ন কৌতূহলও আছে। কিন্তু ঠেক আমার মনে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কি আর শ্মশানে যাওয়া যায়? আবার চান করতে হবে না তো?'

'তা কেন হবে?' চক্কোত্তিমশাইয়ের সপ্তম হাসি ঢং ঢং করে বাজলো, 'শ্মশান হলো পুণ্যক্ষেত্র। যখন খুশি যাওয়া চলে। তবে হ্যাঁ, মড়া পুড়িয়ে যারা চান করেনি, তাদের ছোঁয়াছুঁয়ি করা চলবে না। তাহলেই আবার গঙ্গায় ডুব দিতে হবে।'

আশ্বস্ত হলাম। শব অশুচি, শ্মশান শুচি। চক্কোত্তিমশাই সঙ্গে রয়েছেন বলেই, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা। তাঁর বিধান তো জানা নেই। জীবনের শেষ দিনের ঠাঁই বলে কী না জানি না। চলার পথে যেখানেই শ্মশান পেয়েছি, সেখানে একবার পাক দিয়েছি। বৈরাগ্যের কারণে না। যেন নিজের সঙ্গেই একবার মুখোমুখি দেখা করা। আয়ুষ্কালের দিনগুলোতে মাঝে মাঝে দৃষ্টি বিনিময়।

বাঁয়ে ঘুরে শ্মশানের ঢালুতে পা দিলাম। চক্কোত্তিমশাই আমার হাত চেপে ধরলেন, 'কাণ্ড দেখ, এখনও পিণ্ডি শেষ হয় নি। মড়া নিয়ে এরা এতক্ষণ ধরে কী করছিল?'

পিণ্ডি বা পিণ্ড, বুঝি না। তবে, আমিও আশা করেছিলাম, এসে দেখবো, চন্দ্রাবলীর চিতা এতক্ষণে জ্বলছে। অন্য দিকে এক চিতা নিভেছে। সেই বৃদ্ধার চিতা জ্বলছে, যাঁর প্রৌঢ় পুত্র 'মালের' টাকার শোকে কান্নাকাটি করছিল। এখন তাকে দেখছি না। অথচ চন্দ্রাবলীকে এখনও একটা চাটাইয়ের ওপর শোয়ানো। লাল পাড় শাড়িতে শরীর জড়ানো। বাহিকার দল, আর রুকি লতারা আশেপাশে ছড়িয়ে। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। সিদ্ধিঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণ শেষ করলো। হাত বাড়ালো সন্ধেতারার দিকে। সে কী একটা গুঁজে দিল সিদ্ধিঠাকুরের হাতে। মহাশয় সেই বস্তু হাতে নিয়ে, চন্দ্রাবলীর চোখে কানে নাকে ও ঠোঁটে ছোঁয়ালো। পায়ের কাছে সরে এসে, শাড়ির ওপর নিম্নাঙ্গে ছোঁয়ালো।

'কে জানে, সোনা না কাঁসা, কী দিয়ে কাজ সারছে।' চক্কোত্তিমশাই নিজের মনেই বললেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কী হচ্ছে।'

'পিণ্ডদানের আগে, সোনা বা অভাবে কাঁসা ছোঁয়াতে হয়। চোখে কানে মুখে নাকের ফুটোয় আর, ঐ তোমার ইয়েতে—মানে, ইন্দ্রিয়তে।' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'মনে হচ্ছে সোনাই ছোঁয়ালো, নইলে সিদ্ধি ব্যাটা ওটা ট্যাঁকে গুঁজতো না।'

সিদ্ধিঠাকুর ইতিমধ্যে হাঁক দিয়েছে 'কই, পিন্ড কই ? কার কাছে ?'

রুকি একটা মাটির মালসা এগিয়ে নিয়ে গেল, 'এই যে।'

দূরে থেকেও দেখতে পাচ্ছি, মালসায় চাল-কলা চটকানো। তার সঙ্গে আরও কিছু থাকতে পারে। সিদ্ধিঠাকুর উঁচু স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করলো, 'অপাহতা অসুরা…।'

বাকিটা কানে ঢোকবার আগেই চক্কোত্তিমশাই বলে উঠলেন, 'মূর্খ ! ব্যাটা মন্ত্রের কিছুই জানে না, আবার হেঁকে আওড়াচ্ছে। শুরুটা তো বললেই না. ব্যাটা উচ্চারণ করছে অপাহতা। গাধা কোথাকার।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি ওকে চেনেন নাকি ?'

'চিনিনে ? অসচ্চরিত্র, লম্পট।' চক্কোত্তিমশাইয়ের চোয়াল নড়ছে, 'অথচ নাম করা ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে। চিরকাল এই করে কাটালো। এখন বেবুশ্যেদের পুরোতগিরি করা হচ্ছে।'

আমার চোখ তখন সিদ্ধিঠাকুরের দিকে। চন্দ্রাবলীর ঠোঁট ফাঁক করে, মালসার চাল-কলার পিন্ড গুঁজে দিল। মন্ত্রোচ্চারণ শেষ। হেঁকে বললো, 'এবার চিতেয় তুলতে হবে।'

চিতা সাজানোই ছিল। বংকা বেজি খেটোর দল ছিল কাছে। তারা এগিয়ে গেল। সন্ধেতারা হাত তুলে কিছু বললো। দেখা গেল শববাহিকারাই চন্দ্রাবলীকে ধরাধরি করে চিতার ওপর শোয়ালো। চক্কোত্তিমশাই নিচু স্বরে গজগজিয়ে উঠলেন, 'হারামজাদার কান্ড দেখ। কুশের ওপরে দক্ষিণ শিয়রে না শোয়ালি, আর একবার চানের বদলে গঙ্গাজল দিয়ে গা ভিজিয়ে দিবি তো।'

যাঁর যেদিকে ধ্যান। জীবনে কয়েকবার শব কাঁধে শ্মশানযাত্রী হয়েছি। দাহকার্যও দেখেছি, স্নান শেষে ঘরে ফিরেছি। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম কখনো লক্ষ্য করিনি। চক্কোত্তিমশাই নিজের মনেই বললেন, 'দেখি, এবার মুখাগ্নিটা কে করে ? মেয়েমানুষটার ছেলেপিলে কেউ আছে কী না কে জানে।'

'নেই।' আমি বললাম।

চক্কোত্তিমশাই আমার দিকে ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন, 'তুমি জানলে কী করে ?'

'ওদেরই একজন আমাকে বলেছিল।' ভিতরে ভিতরে সিঁটিয়ে গেলাম।

চক্কোত্তিমশাই কেবল আওয়াজ দিলেন, 'হুম।'

'প্যাকাটি, প্যাকাটি কোথায় ?' সিদ্ধিঠাকুর হাঁকলো।

চারুবালা পাঠকাঠির গোছা এগিয়ে দিল। সিদ্ধিঠাকুর হাতে নিয়ে বললো, 'একজন কেউ জ্বালিয়ে দাও।'

বেজি এগিয়ে গিয়ে, দেশলাইয়ের কাঠি ধরালো। পাটকাঠির মুখে ধরতে একটা জ্বললো। বাকিগুলো সিদ্ধিঠাকুর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেই জ্বালালো। চক্কোত্তিমশাইয়ের স্বরে বিস্ময়, 'ও-ই মুখাগ্নি করবে নাকি ?'

চন্দ্রাবলীর মাথা উত্তর শিয়রে। সিদ্ধিঠাকুর দক্ষিণে বসে, পাটকাঠির আগুন তিনবার চিতার ওপর ঘুরিয়ে নিল। তার সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ। কিন্তু এবার আর মন্ত্র শোনা গেল না, কেবল ঠোঁট নড়তে লাগলো। তারপরে চন্দ্রাবলীর মুখে আগুন স্পর্শ করলো।

'ফেরেব্বাজ, হারামজাদা মহা ফেরেববাজ।' চক্কোত্তিমশাই বলে উঠলেন, নিজেই পুরোত, নিজেই পিন্ড খাওয়াচ্ছে, আবার নিজেই মুখাগ্নি করছে। বেশ্যের ধনসম্পত্তি নিশ্চয় কিছু পেয়েছে।'

সন্ধ্যেতারার কথাগুলো আমার মনে পড়লো। কিন্তু বলতে ভরসা পেলাম না। চক্কোত্তিমশাই নিজেই যথার্থ অনুমান করে নিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মুখাগ্নি করলে তো কাছা নিতে হবে।'

'ছাই নিতে হবে।' চক্কোত্তিমশাই ঝেঁজে বললেন, 'বেশ্যার জার, ওর আবার উত্তুরি কাছা কিসের ? দিব্যি খাবে দাবে। তোফা থাকবে। নেহাত নিয়মকানুন মানলে, চার দিনে ভূর্ষৎসর্গ করবে, মিটে যাবে শ্রাদ্ধ। ছ' দান দিতে হয় ব্রাহ্মণকে। অন্ন, জল, বস্ত্র, তাম্বুল, দীপ আর আসনদান। তাও নিজেই সে সব নেবে।'

ইতিমধ্যে বংকা বেজিরা ডোমের সঙ্গে কাঠ চাপাতে শুরু করেছে। খেটো একগুচ্ছ পাঠকাঠি জ্বালিয়ে একটা কাঠ জ্বালাচ্ছে। সিদ্ধিঠাকুর চুপচাপ। চন্দ্রাবলীর শরীরের ওপর কাঠ চাপানো দেখছে। শববাহিকারা একসঙ্গে গায়ে গায়ে বসেছে। কাঠের সঙ্গে পাটকাঠিও চাপানো হচ্ছে। খেটোর হাতের কাঠ জ্বলে উঠেছে। ডোমের ইশারায় সে চিতায় জ্বলন্ত কাঠ ছোঁয়ালো। ধূমায়িত-চিতা আস্তে আস্তে জ্বলতে লাগলো। এই সময়েই বংকার চোখ পড়লো আমাদের দিকে। সে বাকিদের দিকে তাকিয়ে কী বললো। সন্ধেতারার দল, আর রুকি লতা, সবাই আমাদের দিকে তাকালো। বংকা ছুটে এগিয়ে আসবার আগেই, চক্কোত্তিমশাই পা বাড়িয়ে আমাকে ডাকলেন, 'এসো'।

আমরা কয়েক পা এগোতেই বংকা কাছে এসে পড়লো। চক্কোত্তিমশাই ব্যস্ত স্বরে বললেন, 'দেখিস, ছুঁয়ে দিসনে যেন।'

বংকা এক পা সরে গিয়ে বললো, 'সব ঠিক আছে তো কাকাবাবু ?'

'দায়িত্ব যখন নিয়েছি, বেঠিক থাকবে কেন ?' চক্কোত্তিমশাই গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সন্দেহ থাকলে, ওকে জিজ্ঞেস কর।'

বংকা আমার দিকে তাকালো। আমি হাসলাম। এর পরেও বংকার তাকাবার দরকার ছিল না। তবু আমি বললাম, 'আমার জন্য ওঁকে কষ্ট করতে হয়েছে।'

'তুমি আবার ও-সব বলেছো কেন ?' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'অসময়ে যা পেরেছি, তাই করেছি।'

ইতিমধ্যে সন্ধেতারা, চারুবালা, রুকি আর লতাও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ধেতারা চক্কোত্তিমশাইয়ের উদ্দেশে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে বললো, 'ঠাকুর-মশাই, বাবাকে আপনার বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমাদের উদ্ধার করেছেন।'

চক্কোত্তিমশাই সন্ধেতারার দিকে নির্বিকার মুখে তাকালেন। কোনো জবাব দিলেন না। আমার পিছন থেকে ফিসফিস স্বর শোনা গেল, 'কোনো কষ্ট হয়নি তো ?'

আমি পিছনে মুখ ফেরালাম। রুকি আর লতা পাশাপাশি। দুজনেরই জিজ্ঞাসু চোখ আমার দিকে। প্রশ্নটা কে করেছে, বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'না। যথেষ্ট যত্নআত্তি করেছেন।'

'যাক, এইটুকু শুনে সার্থক হলাম।' লতা চুপি চুপি স্বরে হেসে বললো।

রুকি বললো, 'তুই তো আগে সাথক হবি। বংকাদার ব্যবস্থা যে।'

লতার মুখে লজ্জার ছটা, 'আহা, ও তো তোদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেই ব্যবস্থা করেছে।'

'দাদা ভারি চিন্তেয় পড়ে গেছলেন।' রুকি হেসে আমার দিকে তাকালো, 'ভেবেছিলেন, ওঁকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব।'

লতা বললো, 'তা যে যাব না, সেকথা তো আগেই বলেছি। আমাদের ঘরে উনি কখনো যেতে পারেন ?'

পথে বেরিয়ে, পায়ে এমন কোনো বেড়ি পরিনি, দিকশূলের গণ্ডী বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তবু স্বীকার করতে হবে, সব মানুষের, সব ঠাঁই, ঠাঁই না। কোথাও সে মূর্তিমান বেমানান। বললাম, 'চিন্তায় পড়ি নি। সব জায়গায় তো সবাইকে মানায় না।'

রুকি আর লতা চোখে চোখে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলো। রুকি চোখের পাতা নাচিয়ে বললো, 'শুনলি লতা, আমাদের ঘরে না যাবার ওজর দাদা কেমন সুন্দর করে শুনিয়ে দিলেন।'

'ওজর কেন, সত্যি তো, ওঁকে আমাদের ঘরে মানায় না।' লতা বললো। তারপরেই একবার দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে, কালো চোখের তারা ঘোরালো, 'তবে সত্যি বলছি। তবু যেন ইচ্ছে করে, এমন মানুষকে ঘরে নিয়ে বসিয়ে দুটো কথা বলি।'

রুকি অবাক চোখে একবার আমাকে দেখে নিল, 'বলিস্ কী লো মুখপুড়ি ? এমন কথা বলতে পারলি ?'

'আহা, আমি কি খারাপ ভেবে কিছু বলেছি ?

লতাও একবার আমার মুখের দিকে দেখে নিল, 'এ রকমের মানুষ দেখেই তো পচে মরছি। এমন মানুষ কি আমাদের কখনো মেলে ? ইচ্ছে করে, তাই বললাম। রাগ করবেন না যেন।' আমার দিকে তাকিয়ে, সাদা জমির চওড়া লালপাড়ের ঘোমটা একটু টেনে দিল।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপা, আর চোখের তারা ঘোরানোর সঙ্গে, জীবনযাপনের ছবিটা স্পষ্ট। তারপরেই ঘোমটা টেনে দেওয়ায় একটা অন্য ছবি ফুটে উঠলো। সহবত বা সম্মান দেখানো, যা-ই বলো। ছলনা হলেই বা ক্ষতি কী ? কথাবার্তা যা কিছু ওদের দুজনের মধ্যে। তবু বললাম, 'না, রাগ করি নি।'

'ঠাকুরমশায়ের বাড়ি গিয়ে, নিম পাতা দাঁতে কেটেছিলেন তো ?'

লতার জিজ্ঞাসা শুনে আবার ওর দিকে তাকালাম। শ্মশানযাত্রীর ওটা একটা• নিয়ম বটে। কিন্তু নিমপাতা তো চক্কোত্তিমশাই আমাকে দেননি। বললাম, 'না তো।'

রুকি লতার গায়ে খোঁচা দিয়ে বললো, 'কী কথা বলিস ? ঠাকুরমশাইয়ের কারোকে তো বইতে হয়নি, উনি নিমপাতা দেবেন কেন। আমাদের দেবার কথা।'

লতার মুখে বিব্রত লজ্জার হাসি, 'তাও তো বটে। কিন্তু আমাদের বাড়ি তো যাবেন না। আমরাই আপনার নিমপাতা।'

'মুখপুড়ি, আমাদের দাঁতে কাটবেন নাকি ?' রুকি আবার লতার গায়ে খোঁচা দিল।

ঘাট থেকে ফিরে শ্মশানযাত্রীর নিমপাতা দাঁতে কাটা শুদ্ধিকরণের কারণ কী না জানি না। যদি তাই হয়, তবে সেই পুণ্যি পাতায় দাঁত ছোঁয়াই মনে মনে। বললাম, 'কেটে দিয়ে গেলাম।'

লতার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠলো।

ওদিকে তখন অন্য বৃত্তান্তের শুনানী চলছে। চক্কোত্তিমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তা, তোদের এত দেরি কেন। এতক্ষণে তো মড়া অর্ধেক পুড়ে যাবার কথা।'

সন্ধেতারা বললো, 'আর বলেন কেন ঠাকুরমশাই। আমাদের পাড়ার সিংজীবাবু বলে একটা লোক পুলিস নিয়ে এসে হাজির। বলে কি না চাঁদকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে, এ মড়া পোড়ানো চলবে না, চুঁচড়োয় নিয়ে যেতে হবে। বলেন তো কী সব্বনেশে কথা ! আসলে পুলিসকে ঘুষ খাইয়ে নিয়ে এসেছে। সিংজীবাবুর বড় জ্বালা, চাঁদ তার ঘর বাড়ি সব সিদ্ধিঠাকুরকে বিক্রি কোবালা করে দিয়ে গেছে। ত, সিদ্ধিঠাকুর ছেড়ে কথা বলবার লোক নয়। সঙ্গে বড় দারোগাবাবু থাকলে আলাদা কথা। তাও ছিল না। এক জমাদার আর দুই সেপাই নিয়ে এসেছিল। সিদ্ধিঠাকুর বললে, 'বেশ, তাই নিয়ে চলো। তবে বিষ খাওয়ানো যদি প্রমাণ না হয়, তবে সিংজী তোমাকে নিজের হাতে বিষ খেতে হবে। আমরাও হইচই জুড়ে দিলাম। চাঁদ আমাদের চোখের সামনে মরেছে। তারপরে সিংজী কী ভাবলে, কে জানে। পুলিসদের

সঙ্গে ফিসফাস করে শাসিয়ে গেল, আমাদের সন্ধাইকে নাকি জেল খাটিয়ে ছাড়বে।'

'ঝামেলার কথা আর বলবেন না কাকাবাবু।' বংকা বললো, 'লোকের ভিড় সামলানো দায়। এই সব ঝামেলা কাটাতেই এত দেরি।'

চক্কোত্তিমশাই আস্তে আস্তে ঘাড় ঝাঁকালেন, 'হুঁম, বুঝেছি। সিদ্ধি যখন একাধারে পুরোত, পিণ্ডি খাওয়াচ্ছে আবার মুখাগ্নিও করছে তখনই বুঝেছি, সম্পত্তির ব্যাপার আছে। যাক, ও সব তোমাদের ব্যাপার। তোমরা বুঝবে, আমরা চলি।'

আমি সিদ্ধিঠাকুরকে দেখছিলাম। চন্দ্রাবলীর চিতায় এখন লেলিহান শিখা। বাতাস তেমন নেই। সিদ্ধিঠাকুর অপলক চোখে ঊর্ধ্বশিখার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের কি সে দেখতে পায় নি? তার মুখের আধখানা দেখতে পাচ্ছি। অভিব্যক্তি বোঝবার উপায় নেই। চন্দ্রাবলী বিরহে কি এখন তার প্রেমের চিতাও জ্বলছে? বোধ হয় না। তার সম্পর্কে ইতিমধ্যে যেটুকু শুনেছি, তা থেকে একটা চরিত্রের ছিটেফোঁটা বোঝা যায়। চন্দ্রাবলী যদি তার সম্পত্তি না দিয়ে যেতো, সম্ভবত সিদ্ধিঠাকুরকে আজ এই শ্মশানে দেখা যেতো না। এখন এই চিতার দিকে তাকিয়ে যদি তার প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে, কিছু বলবার নেই। কিন্তু সেই সম্পত্তির সদগতি কী ভাবে হবে তাও অনুমান করা যায়। যে-লোক সন্তানদের মুখের দিকে তাকায় নি, জীবনে কোনো দায়িত্ব বহন করে নি, এ কৃতজ্ঞতাও তবে ছলনা। কৃতিত্ব তার একটাই। অথবা জাদুকর। সে একজন গণিকামোহন পুরুষ।

চক্কোত্তিমশাই পিছনু ফিরে হাঁটা দিলেন। আমি সকলের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চলি।'

'এসো বাবা। ভগবান তোমার ভালো করুন।' সন্ধেতারার চোখে জল। বুকের কাছে দু হাত জড়ো করা।

রুকি লতার মুখের হাসিতে তেমন ঝলক নেই। দুজনেই কপালে দু হাত ঠেকিয়ে মাথা নিচু করলো। আমিও কপালে হাত ঠেকালাম। লতা বললো, 'বলতে তো পারিনে, আবার আসবেন। তবে নিমপাতা দাঁতে কাটলে, পরে একটু মিষ্টি মুখ করে যেতে হয়।'

বললাম, 'তাও করেছি।'

'মানুষ বুঝে কথা। সবাইকে তো সব কথা বলা যায় না।' রুকি প্রকৃতই গম্ভীর হয়ে উঠলো।

রুকির কথা শুনে আমার নিজের কথাটাই মনে পড়ে গেল, 'সবাইকে তো সব জায়গায় মানায় না।' সমাজ সংসারের ক্ষেত্রে যুক্তির কথা বটে। কিন্তু এক দেহোপজীবিনীর শব বহন করাটাও আমার পক্ষে মানানসই ব্যাপার ছিল না। তবু বইতে হয়েছিল। অতএব, জীবনটা বাঁধা ছকে চলে না। কর্মে আর দৈবে, সেইখানেই মিল অমিলের দ্বন্দ্ব। রুকি আর লতাকে যুক্তির কথা শুনিয়ে গেলাম। তবে হেথা নয়, অন্য কোথাও, ভবিষ্যতে হয়তো ওদেরই অঙ্গনে একদিন দাঁড়াতে হতে পারে। সে-কথাটা এখন আর ওদের বলে লাভ নেই।

আর একবার ওদের দিকে তাকিয়ে, মুখ ফিরিয়ে পা বাড়ালাম।

'তবু যদি মনে থাকে—।' পিছনে লতার স্বর বেজে উঠে থেমে গেল।

আমি আর ফিরে তাকালাম না। মনে তো সবই থাকে। তবু সে নদী-নিরন্তরের তীর। কালের জোয়ারে পলি স্তরে অনেক স্মৃতি ঢাকা পড়ে যায়। আবার ভাটার ঢলে স্মৃতি সহসা ঝলকিয়ে ওঠে। আমার পাশে পাশে ছোঁয়া বাঁচিয়ে এগিয়ে এলো বংকা। বললো, 'অনেক কষ্ট দিলাম দাদা। অন্যায় কিছু হয়ে থাকলে মাফ করবেন।'

'কিছু না, কিছু না।' আমি তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেলাম।

বংকা হয়তো বঙ্কিম কিংবা বংকুবিহারী। সংসারের বিপরীত সীমানায় চলে গিয়েও এখনও সংসারের সহজ সহবত একেবারে ভুলতে পারেনি। আমি ঘাটের ওপর এসে দাঁড়ালাম। চক্কোত্তিমশাই দাঁড়িয়েছিলেন ঘাটের সর্বোচ্চ ধাপে। কাছে যেতেই বললেন, 'মনে হচ্ছে, তুমি আর ট্রেন ধরতে পারবে না। শ্যামাক্ষ্যাপার সঙ্গে কথা বলে তোমাকে আজ ফিরে যেতেই হবে। অথবা—'

'ও'র সঙ্গে দেখা না করলেই কি নয়?' আমি চক্কোত্তিমশাইয়ের কথা শেষের আগেই বলে উঠলাম।

চক্কোত্তিমশাই একটু যেন জোর দিয়ে বললেন, 'সেটা ঠিক হবে না। সে এদিকেই তাকিয়ে আছে। এবার খানিকক্ষণের জন্য ঘাটে এসে বসবে। রোজই বসে।'

নৌকার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পুবের মুখগুলো এখন পশ্চিমে। শ্যামা-ক্ষ্যাপার লম্বা চুল, মাথার ওপরে ঝুঁটি করে বাঁধা। ডান হাত তুলে আমাদেরই যেন কোনো ইশারা করলেন। চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'তোমাকেই দাঁড়াতে বলছে। একটু থেকে যাও। তারপরে যদি ঠিক কর, এখানেই থেকে যাবে, তবে আমাদের বাড়িতেই চলে এসো। আমার পরিবার (অর্থাৎ ও'র স্ত্রী) আর মেয়ের তো খুবই ইচ্ছে। দুই ছেলেই কাজে গেছে। তোমার সঙ্গে দেখা হলে ওরাও খুশি হবে।'

আমি বললাম, 'যদি থাকি—'

'থেকেই যাও। নবদ্বীপের গাড়ি তো ধরতে পারবে না।' চক্কোত্তিমশাইয়ের অষ্টম হাসিটি দন্তহীন ঠোঁটে অস্তাভার আলোয় ম্লান। বললেন, নাটক নভেল পড়বার দিন চলে গেছে। ছেলেমেয়েরা পড়ে। তবে তুমি এলে আমারও ভালো লাগবে।'

আমি জানি, আজ আমাকে ফিরে যেতেই হবে। সকালের যাত্রায় কাঁটা পড়ে গিয়েছে দুপুরেই। তবু বললাম, 'চেষ্টা করবো।'

'সংসার বড় বিচিত্র।' চক্কোত্তিমশাইয়ের ঠোঁটে এখনও অস্টম হাসির স্পর্শ লেগে আছে, 'চেষ্টা করো। এবার আমি যাই।'

তিনি ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াবার উদ্যোগ করলেন। আমার শরীরটা আপনা থেকেই নুয়ে পড়লো। আমি ওঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে অস্ফুটে কিছু বললেন। তারপরে পিছন ফিরে চলে গেলেন। সংসারকে ওঁর এই মুহূর্তেই বড় বিচিত্র মনে হলো। তার চেয়ে বিচিত্র উনি নিজে। দুপুরের প্রথম দর্শনে দেখেছিলাম এক মানুষ। এখন চলে গেলেন আর এক মানুষ। মানুষ চেনা দায়। এখনও দেখতে পাচ্ছি, তিনি দক্ষিণে গিয়ে পশ্চিমে মোড় নিয়ে চলেছেন। তাঁর পাশেই যেন দেখতে পাচ্ছি বাগানের দরজায় পুষি দাঁড়িয়ে আছে।...

আমি নৌকার দিকে ফিরে তাকালাম। এখন আবার মুক্তবেণীর ঘূর্ণি-স্রোতের টান। ডুবি কি বাঁচি, জানি না। নিশ্চল হয়ে আছি। ক্ষ্যাপাবাবা আমাকে নিয়ে কেন ক্ষেপলেন, বুঝি না। আমিও ক্ষ্যাপার মন নিয়ে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু চক্কোত্তিমশাইয়ের কথাটা অমান্য করতে পারছি না।

দেখছি, মাঝি ইতিমধ্যেই নোঙ্গর টেনে তুলেছে। এক লগি ঠেলে, নৌকা এগিয়ে আনছে ঘাটের দিকে। আর এক মাঝি ভাটার টান, লগি চেপে রুখছে।

নৌকার উত্তরের গলুই আস্তে আস্তে ঘাটের পৈঠায় ঠেকলো। দক্ষিণের গলুই ঘাটের সিঁড়ির মাঝামাঝি। ক্ষ্যাপাবাবার দৃষ্টি ওপরের সিঁড়ির দিকে। প্রথম দেখা গৌরাঙ্গী তাঁর এক পাশে বসে, আর এক পাশে এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী। রমণী বটে, বয়সে যুবতী। মুখোমুখি সেই মন্দিরাবাদক। ক্ষ্যাপাবাবার দৃষ্টি ঘাটের ওপর দিকে। তাঁর গোঁফদাড়ি নড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে, কিছু বলছেন। উত্তরের গলুইয়ের কাছে মাঝি আবার নোঙ্গর তুলে নিল। শক্ত হাতে ছুঁড়ে দিল পৈঠার গায়ে পলি ডাঙ্গার ওপরে। দক্ষিণের সিঁড়ির কাছের মাঝি লগি তুলে রাখলো। দাঁড়ের খুঁটি ধরে সিঁড়িতে নামলো। ভাটার টানের জোর বেশি। সে লগি টেনে নিয়ে জায়গা বুঝে জলের নিচে মাটিতে পুঁতলো। খুঁটির দড়ি টেনে বাঁধলো। নৌকা এখন ঘাটের গায়ে লাগানো।

চক্কোত্তিমশাই চলে গিয়েছেন, অন্তত বিশ মিনিট আগে। এর মধ্যেই ম্লান রক্তিম রোদে ছায়া নেমে এসেছে। চিতার ধোঁয়ার গন্ধ বাতাসে। আমার কাঁধে ঝোলা। হাতে ভিজা জামাকাপড়ের পুঁটলি। দাঁড়িয়ে আছি ঘাটে। পায়ে আমার বেড়ি পরিয়ে রেখে গিয়েছেন চক্কোত্তিমশাই। দেখছি, কতোক্ষণে

শ্যামাক্ষ্যাপা ডাঙ্গায় নেমে আসেন। কে দেন মন্ত্রণা। কে ভোগ করে যন্ত্রণা।

মন্দিরাবাদক ঢুকলো ছইয়ের মধ্যে। বেরিয়ে এলো পলকেই। হাতের ভাঁজ করা বস্তুটি দেখে মনে হলো মোটা ভারি শতরঞ্চি জাতীয় কিছু। পা বাড়ালেই চওড়া পৈঠা। নেমে এসে কয়েক ধাপ ওপরে উঠলো। শতরঞ্চির ভাঁজ খুলে পৈঠা আর সিঁড়ির খানিকটা জুড়ে পাতলো। ক্ষ্যাপাবাবাও উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে রমণীদ্বয়। প্রথমার মতো, দ্বিতীয়ারও শাড়ি-জামায় আধুনিকতার ছোঁয়া। দুজনেরই দেখছি চুলে খোঁপা বাঁধা। গৌরাঙ্গীর গায়ে একটি কালো শাল। শ্যামাঙ্গীর লাল। উঁচু ধাপ থেকেও দেখতে পাচ্ছি, দুজনের কারো অঙ্গেই কোনো অলংকারের ঝিলিক নেই। ক্ষ্যাপাবাবার গায়ে দুপুরের সেই কম্বলটিই জড়ানো। দাঁড়াবার পরে দেখছি, তাঁর গাঢ় গেরুয়া বা রক্তবাস কচ্ছহীন।

অতঃপর ক্ষ্যাপাবাবা কি দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে নামবেন? না, সে-রকম কিছু করলেন না। দীর্ঘদেহী মানুষটি নিজেই পৈঠায় পা দিয়ে নেমে এলেন। বুকের কাছে কম্বলটা আলগা হয়ে গেল। ফাঁকে দেখা গেল, ভিতরে কোনো জামা নেই। গলা থেকে বুকে ঝুলছে রুদ্রাক্ষের মালা। [illegible]মে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। ইতিমধ্যে মন্দিরাবাদক ওপরে উঠে [illegible]লা। আমার সামনে এক ধাপ নিচে দাঁড়িয়ে, রীতিমত ভদ্রোচিত বিনয়-[illegible]ক্য নিবেদন, 'বাবা আপনাকে ডাকছেন।'

'স্মরণ করেছেন' বললেই যেন শোভা পেতো। আমি বিনা প্রশ্নেই সিঁড়ি [illegible]তে লাগলাম। ক্ষ্যাপাবাবা পুব মুখো হয়ে শতরঞ্চির ওপর বসে গিয়েছেন। দুই যুবতীও নেমে এসে বসলো তাঁর এক পাশে, পাশাপাশি। মনে একটা জিজ্ঞাসা ছিল। কাছাকাছি নেমে এসে দেখলাম, যুবতীদের সিঁথি শাদা। মন্দিরাবাদক শতরঞ্চি পাতা সিঁড়ির এক ধাপ নিচে নেমে আমাকে আবার ডাকলো, 'এখানে আসুন।'

ক্ষ্যাপাবাবা মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন। ধূসর গোঁফদাড়ি মুখে, উন্নত নাসা, বড় এক জোড়া চোখ আগেই দেখেছিলাম। এখন দেখলাম চোখ দুটি উজ্জ্বল। মাথার চুল চূড়ো করে ঝুঁটি বাঁধা, মুখটি সেইজন্যই যেন লম্বা দেখাচ্ছে। বার্ধক্যের রেখা অল্পবিস্তর থাকলেও মুখে একটি কোমলতা আছে। একদা খুবই সুপুরুষ ছিলেন, দেখলেই বোঝা যায়; এবং এখনও। তাঁর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ের পরেই গৌরাঙ্গী আর শ্যামাঙ্গীর সঙ্গেও সংখ্যায় ছ'চোখের মিলন। হাসি হাসি মুখ। চোখে কৌতূহল। ক্ষ্যাপাবাবা হেসে ডাকলেন, 'এসো হে ধর্মাত্মা, এদিকে এসো।'

ক্ষ্যাপাবাবার স্বর মোটেই ক্ষ্যাপাটে না। বজ্রকণ্ঠের হুংকার নেই। বরং ভরাট গম্ভীর স্বরে কোমলতার আভাস। তবে বিদ্রূপ আছে কী না, বুঝতে

পারছি না। আমি এক ধাপ নেমে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। তিনি আমার পাশে মন্দিরবাদককে বললেন, 'ওরে রতন, ওর হাত থেকে ভেজা কাপড়ের পুঁটলিটা নে। এক জায়গায় রাখ।'

রতন আমার হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে সিঁড়িতেই রাখলো। ক্ষ্যাপাবাবা ঝুঁকে পড়ে আমার হাত টেনে ধরলেন, 'এসো ধর্মাত্মা, আমার কাছে এসে বসো।'

চক্কোত্তিমশাইয়ের মুখেই শুনেছিলাম, তিনি আমাকে ধর্মাত্মা বলেছেন। শুনলে বিদ্রূপ ছাড়া, আর কিছু মনে আসে না। যে কারণে ধর্মাত্মা মহাত্মা, আমি সে-রকম কোনো ধর্মেও নেই। মহত্ত্বেও নেই। পায়ের স্যান্ডেল খুলে শতরঞ্চির ওপর উঠলাম। ক্ষ্যাপাবাবা টেনে বসিয়ে দিলেন তাঁর পাশে। অন্য পাশে দুই যুবতী। রতনও বসলো আমার কাছাকাছি। পা রাখলো নিচের সিঁড়িতে। ক্ষ্যাপাবাবা আমার হাত ধরেই আছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'গৌরহরি চক্রবর্তী আমার কথা তোমাকে বলেছিল?'

'হ্যাঁ। উনি আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে বলেছিলেন।' আমি বললাম।

ক্ষ্যাপাবাবা তাঁর বড় উষ্ণ হাতে আমার হাতে চাপ দিয়ে বললেন, 'ভেবেছিলাম আমি নিজেই তোমাকে বলবো। কিন্তু চক্রবর্তীকে দেখেই বুঝলাম, তোমাকে সে নিয়ে যাবে। তাই তাকেই বলতে হল। নইলে, তুমি যখন চা[illegible] করছিলে তখনই বলতাম। ভাবলাম, চক্রবর্তীর সঙ্গে চলে গেলে, ধর্মাত্মাটিকে[illegible] আর পাবো না।'

ভেবেছিলাম, ঠাট্টা বিদ্রূপ যাই হোক, কিছু বলবো না। কিন্তু মনের[illegible] গতি ভিন্ন পথে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ধর্মাত্মা বলছেন কেন, বুঝতে পারছি নে'

ক্ষ্যাপাবাবা দুই যুবতীর দিকে তাকিয়ে হেসে ভুরু নাচালেন। রতনে[illegible] দিকেও তাকালেন। সকলের মুখেই মিটিমিটি হাসি। ভুরুর নাচে কথা আছে। ইঙ্গিতে প্রমাণ। কিন্তু কথা কোন দিকে বহে, বুঝতে পারি না। তিনি বললেন, 'কেমন, যা বলেছিলাম, মিলে যাচ্ছে তো?'

দুই যুবতী আর রতনের হাসি কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হলো। মুখে বাক্য নেই। ক্ষ্যাপাবাবা আমার হাতে চাপ দিয়ে বললেন, 'সব দেখলাম, খবর নিলাম, তখনই এদের বললাম, দ্যাখ একটা ধর্মাত্মা এসেছে।'

আমি তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় এখনও সবই প্রায় স্পষ্ট। তিনিও উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে দেখছেন। গোঁফ-দাড়ির ভাঁজে ভাঁজে হাসির উঁকিঝুঁকি। বললাম, 'কিন্তু আমি তো কোন ধর্ম-টর্ম করি নে।'

ক্ষ্যাপাবাবা আবার তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে হেসে ভুরু নাচালেন, 'কী গো গঙ্গা যমুনা, ওরে রতন, মিলে যাচ্ছে তো?'

গঙ্গা আর যমুনা নিশ্চয় দুই যুবতী। সকলেই ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাস্য করলো।

ক্ষ্যাপাবাবা আমার হাতটা একবার তুলে ধরলেন। আবার নামিয়ে নিলেন, 'জানি, তুমি দেবদেবী ভজো না, পুজো আর্চা করো না, ফোঁটা তিলক কাটো না। আমার মতো ভেকধারীও নও, কেবল বেশ্যার মড়া তোমার কাঁধে চেপে বসে।' ভরাট গলায় হা হা হাসলেন। হাসি না, টপ্পা অঙ্গের বড় দানা।

গঙ্গা যমুনা রতনের চোখ আমার দিকে। তাদের হাসিতে আওয়াজ নেই, কেবল ঠোঁটের কোল ছাপিয়ে অঙ্গে ঢেউ তোলে। ক্ষ্যাপাবাবার হাসি লয়ে এসে থামলো, 'তুমি যদি বলো, মড়া তোমার ঘাড়ে কেউ জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে, আমি মানবো না। কর্মের নাম ধর্ম, তোমার ধর্ম। তুমি কাঁধে নিয়েছ। এখন তুমিই ভেবে দেখ, তোমার মধ্যে সেই ধর্ম কোথায় আছে।'

আমি বললাম, 'ধর্ম তো কোথাও নেই। একজন বইতে পারছিল না। আমাকে কাঁধ দিতে বললো। আমি থাকতে পারলাম না।'

'অই অই, ওটিই তোমার ধর্ম।' ক্ষ্যাপাবাবা এবার দু হাত দিয়ে আমার হাত ধরলেন, 'মনের কলে বইসে ধর্ম, করিয়ে নেয় আপন কর্ম। তখন ঘণ্টা বেজে ওঠে। মন্দিরে ঢুকে যে যার ঘণ্টা বাজিয়ে যায়। কারো কারো ঘণ্টা কে বাজায়, দেখা যায় না। কিন্তু শোনা যায়। এখন, তোমাকে আমার [illegible]ত্মা মনে হয়েছে, তাতে তোমার আপত্তিটা কিসের? আমার মনে হলে আমি [illegible] না?' তিনি মুখ এগিয়ে এনে আমার দিকে তাকালেন।

আমি হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলাম না। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে নিবিড় হয়ে আসছে। আমি তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছি। গোঁফদাড়ির [illegible] ভাঁজে বিচ্ছুরিত হাসি। বাকিদের মুখের হাসিও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তাঁদের হাসি এখন ঠোঁটের কূল উপছানো না। বরং চোখের কৌতূহল গভীর। আমি হেসে বললাম, 'আপনার কথা আপনি তো বলবেনই।'

'তবে?' ক্ষ্যাপাবাবার মুখ যেন আরও ঝুঁকে এলো।

আমি অস্বস্তিতে হাসলাম, 'আমার লজ্জা করে।'

ক্ষ্যাপাবাবার ভরাট গলায় আবার সেই টপ্পা অঙ্গের বড় দানা হাসি। আমার হাত ছেড়ে, দু হাত দিয়ে কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন, 'করবেই তো। ওটাও তোমার ধর্ম। তুমি কি আমার কথায় ধেই নেত্য শুরু করে দেবে? এবার বলো তো ওবেলা আমার বাজনা কেমন শুনলে?'

বললাম, 'খুব সুন্দর। অনেক নাম-করা বাজিয়েদের থেকেও আপনার হাত আশ্চর্য রকমের ভালো।'

'আশ্চর্য রকমের ভালো।' ক্ষ্যাপাবাবা দু হাত তুলে তেমনি হাসলেন, 'তোমার প্রশংসা শুনে আমার কিন্তু লজ্জা-টজ্জা করছে না। তাহলে, সত্যি ভালো বাজাতে পারি, অ্যাঁ?' আবার হাসি, 'মনে আনন্দ হলেই বাজাই। ও বেলা তখন আনন্দ হয়েছিল, বাজাতে বসে গেলাম। সুরে কোনো ভুল-টুল হয় নি তো, অ্যাঁ?' তিনি আবার মুখের কাছে ঝুঁকে এলেন।

যাঁর হাতের আঙুলে ঐরকম অপরূপ সুর বাজে তিনি আমাকে ভুলের কথা জিজ্ঞেস করছেন। ঠাট্টা না তো? বললাম, 'ভুলের বিচার জানি নে, মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম।'

আবার সেই টপ্পা অঙ্গের বড় দানা হাসি, 'তোরা শোন, শোন, ও মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। ওর ধর্মটা বুঝে নে।'

গঙ্গা যমুনা রতনের হাসি এখন ঠোঁটের কূল ছাপিয়ে অঙ্গে খেলছে। এখন আর কারোর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। সন্ধ্যার অন্ধকার দ্রুত নামছে। মাঝদরিয়ায় চরের রেখা ঝাপসা। ওপারে অন্ধকার। আমিও মনে মনে ব্যস্ত হলাম। ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'বুঝে নিয়েছি তোমাকে। তা ধর্মাত্মা—'

'দোহাই, ওই বলে আমাকে ডাকবেন না।' আমি বলে উঠলাম।

ক্ষ্যাপাবাবা হেসে বাজলেন, 'কানে বাজে, না? বেশ, ডাকবো না। নাম বলো।'

নাম বললাম। তিনি বললেন, 'খাসা নাম। তা বাপ আমার, এবার বলো তো, কোথা থেকে আসছিলে, কোথায় যাচ্ছিলে?'

বললাম, 'বেশি দূরে থেকে আসিনি, ইচ্ছে ছিল, ত্রিবেণী ঘুরে, ঘুরতে ঘুরতে উত্তরে যাবো।'

'ঘুরতে ঘুরতে উত্তরে?' ক্ষ্যাপাবাবার স্বরে বিস্ময়, 'খোলসা করে বলো বাপ। ঘুরতে ঘুরতে মানে কী? কেমন করে? কোথায়?'

এখানে সত্যি বলতে অসুবিধা নেই। বললাম, 'কোথায়, সে জায়গা ঠিক করে বেরোইনি। হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম? কষ্ট হলে রিক্‌শায় চাপতাম। তেমন দেখলে রেলগাড়ি ধরতাম।'

'অ্যাঁ? রাত হয়ে গেলে থাকতে কোথায়?'

'জায়গা একটা জুটিয়ে নিতাম।'

'তার মানে, আহার যত্রতত্র, শয়ন হট্টমন্দিরে?'

হেসে বললাম, 'তা বলতে পারেন। তবে ঐ হট্টমন্দিরকে একটু ভয়। নিরিবিলি পেলে ভালো।'

'তা বাপ আমার, কী কাজ করা হয়? পেটের ভাবনা ভাবতে হয় তো?'

'তা হয়। কাজও কিছু করি।'

'তারপরেও এইভাবে বেরিয়ে পড়া?' ক্ষ্যাপাবাবার স্বরে বিস্ময় বাড়ছে, 'কী কাজ করা হয়?'

এখানেই ঠেক। হঠাৎ জবাব এলো না মুখে। ক্ষ্যাপাবাবা নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলতে অসুবিধা আছে?'

হেসে বললাম, 'না, অসুবিধে আর কি। কাগজপত্রে একটু লেখালেখি করি। আর বাকিটা সবই অকাজ।'

'ওলো, তোরা শোন। শুনছিস?' ক্ষ্যাপাবাবার স্বরে যেন খুশি

বিস্ময়ের ঢেউ, 'ও কাজ করে, আবার অকাজও করে। তবে অকাজটাকেই ধরি। রতন।'

রতনের তৎক্ষণাৎ জবাব, 'বাবা।'

'ওর ভেজা জামাকাপড়ের পুঁটলিটা নৌকোয় ছুঁড়ে দে।' ক্ষ্যাপাবাবা আদেশের স্বরে বললেন।

আমি ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, 'কেন?'

'সে-জবাব পরে।' ক্ষ্যাপাবাবার স্বর গম্ভীর।

মুখ দেখতে পাচ্ছি না। গাম্ভীর্যটা কপট মনে হলো। বললাম, 'কিন্তু আমাকে যে ফিরতে হবে।'

'কোথায়?'

'ঘরে।'

'মানে, অকাজে বেরিয়ে আবার কাজে?'

'কী করবো বলুন। রাত্রে আর কোথায় যাবো।'

'সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। কী হলো রে রতন।' ক্ষ্যাপাবাবা তাড়া দিলেন।

রতন আমার পুঁটলিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এতক্ষণ ভেবেছিলাম, নামেই ক্ষ্যাপা। মানুষটি আসলে শান্ত সদাশয়। এখন দেখছি, সত্যি ক্ষ্যাপাবাবা। আমি তাড়াতাড়ি রতনের দিকে হাত বাড়ালাম, 'না না, ওটা নেবেন না। আমার যাবার পথে ও-বেলাই কাঁটা পড়ে গেছে। আজ ফিরেই যাবো।'

'ফেরাচ্ছি।' ক্ষ্যাপাবাবার হাত আমার কাঁধে চেপে বসলো, 'ধরা যখন পড়েছ, ছাড়া পাচ্ছো না। সময় পেলে উত্তরের হাঁটাপথে জায়গা জুটিয়ে নিতে। সে-জায়গা আমিই জুটিয়ে দিচ্ছি।'

বলেও বিপদ। রতন সত্যি সত্যি আমার জামা-কাপড়ের পুঁটলিটা নৌকার পাটাতনে ছুঁড়ে দিল। আমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। ক্ষ্যাপাবাবা ক্ষ্যাপা স্বরে বললেন, 'গঙ্গা, দড়ি নিয়ে আয়, এ পালাবার চেষ্টা করছে।'

আমার চোখ ছানাবড়া। দেখি গঙ্গা উঠে দাঁড়ালো। সত্যি দড়ি আনবে নাকি? বেঁধে নিয়ে যাবেন! পরমুহূর্তেই আমার গালে গলায় গোঁফদাড়ির স্পর্শ। ক্ষ্যাপাবাবা দু হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। প্রায় আদর করে গালে গাল ঠেকিয়ে বললেন, 'কেন বাপ এমন করছ? তোমার অকাজের যাত্রাটা আমাদের সঙ্গেই কর। ডাঙাপথে না করে, জলপথে যাবে। খেতে কষ্ট হবে। তা হোক, ও সব কষ্টে তোমার কিছু যায় আসে না, বুঝে নিয়েছি। কিন্তু হট্টগোলে থাকতে হবে না। কথা রাখো বাপ।'

ঘাটে এখনও এদিকে ওদিকে লোক। সবাই যে যার মনে। এমন কি দু একজন স্নানও করছে। ওপরের বিজলী আলোর রেশ নিচে এসে তেমন পৌঁছয়নি। এখানে কী ঘটছে, কারো মাথা ব্যথা নেই। দেখা করতে

এসে এমন ফাঁদে পড়ে যাবো, বুঝতে পারি নি। মন খুলে কথা বলার কী ঝক্কি।

কিন্তু এমন নেই-আঁকুড়ে আদরবাসার লোকও দেখিনি, যাঁকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। কী বলবো, বুঝতে পারছি না। এদিকে গোঁফদাড়ির সুড়সুড়িতে অস্বস্তি।

'দাঁড় কি আনবো বাবা ?' অন্ধকারে গঙ্গার স্বরে যেন বীণার ঝংকার। বীণার ঝংকারে, দাঁড়ির প্রশ্ন।

অন্য স্বরে মন্দিরার মৃদু ধ্বনি যেন বেজে উঠেই থেমে গেল। যমুনা হাসছে ? ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'দাঁড় আনবি কি হাতে ধরে নিয়ে যাবি, সব ওর ওপরে নির্ভর করছে।' স্বর চড়িয়ে বললেন, 'কই রে লোচন, বাতি-টাতি জ্বালবি নে ?'

নৌকা থেকে জবাব এলো, 'ভেতরের হারিকিন জেবলে দিইচি বাবা। বড় বাতি জ্বালতে নেগেচি।'

'তা হলে চলো বাপ, ভেতরে গিয়ে বসি।' ক্ষ্যাপাবাবা মুখ সরিয়ে নিলেন, 'এ ঠান্ডায় বসে কষ্ট হবে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'এখনই নৌকা ছেড়ে দেবেন নাকি ?'

'না, কাল ভোরে রওনা দেবো।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'ভয় নেই, হাটে না হোক, অনেক ঘাটে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবো।' তিনি আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন।

আমাকেও উঠে দাঁড়াতে হলো। বললাম, 'কিন্তু আমার জন্য আপনাদের অসুবিধে হবে।'

'তা বটে। সেই জন্যই তো তোমাকে নিয়ে আমার এত টানাটানি।' ক্ষ্যাপাবাবার আবার সেই হাসি, 'ব্যাটা ধর্ম ছেড়ে নড়ে না।'

যমুনা উঠে দাঁড়ালো। গঙ্গা বললো, 'দাঁড়ান বাবা, আমি ভেতরের আলোটা বের করে আনি।'

গঙ্গার সঙ্গে যমুনাও গেল। ক্ষ্যাপাবাবা আমার হাত ধরে এক ধাপ নামলেন। রতন শতরঞ্চিটা তুলে ভাঁজ করলো। সকলেরই খালি পা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার স্যান্ডেল জোড়া কী করবো ?'

'গঙ্গায় ফেলে দিতে হবে না। পায়ে পরে নৌকায় ওঠো।' ক্ষ্যাপাবাবা নিজেই আমাকে হাত ধরে সরিয়ে আনলেন।

আমি পায়ে স্যান্ডেল গলিয়ে নিলাম। রতন নৌকায় উঠে গিয়েছে। গঙ্গা ছইয়ের ভিতর থেকে আলো নিয়ে এগিয়ে এলো। ক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে দেখলাম, নৌকা আরও হাতখানেক নিচে নেমেছে। ভাটার টানে জল নামছে। গঙ্গার স্বর শোনা গেল, 'সাবধান, নিচের সিঁড়ি পেছল আছে।'

'লক্ষ্য রাখিস রতন।' ক্ষ্যাপাবাবা আমার হাত জোরে চেপে ধরলেন, 'পা বাড়িয়ে দাও, উঠে পড়ো।'

স্যান্ডেলের নিচে পলি আর শ্যাওলার পিছল টের পাচ্ছি। সাবধানে পা বাড়িয়ে নৌকায় উঠলাম।

ক্ষ্যাপাবাবা আমার হাত ছেড়ে দিলেন। তারপরে নিজে উঠলেন। রতন উঠলো সব শেষে। পাটাতনে পা দিয়ে বুঝলাম, মাজা মিহি পরিচ্ছন্ন কাঠ। ছইয়ের ভিতরে ঢোকবার মুখে, নারকেল দড়ির পাপোষ। সরে গিয়ে স্যান্ডেলটা রাখলাম গলুইয়ের ধারে।

শ্মশানের দিকে তাকালাম। চিতা দেখতে পাচ্ছি না। নৌকা অনেক সরিয়ে আনা হয়েছে। আগুনের আলো দেখতে পাচ্ছি। চন্দ্রাবলীর দেহ পুড়ছে। আগুনে সব একাকার। চন্দ্রাবলীর শরীরে কতো পুরুষের সুখ পুড়ছে ? চন্দ্রাবলীর নিজের কোনো সুখ ছিল কী ? তবে তাও পুড়ছে। দুঃখ যন্ত্রণা ধিক্কার, সব পুড়ছে। ওপরের দিকে তাকালাম। মন্দিরে ঘণ্টা কাঁসর বাজছে। দোকানে রাস্তায় ঘাটের ওপরে, আলো জ্বলছে। লাল পাড় শাড়ি, কপালে সিঁথেয় সিঁদুর, প্রৌঢ়ার কথা মনে পড়ছে, 'আজকের রাতটা এখানেই থেকে যাও।' ত্রিবেণীতে থেকেও বৈপরীত্যের স্রোত কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে। তারপরেও আমার চোখের সামনে ভাসছে, একটা পুরনো বাড়ির দরজায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তো আমাকে 'মিথ্যেবাদী' বলতে পারে না। তাই বোধ হয়, তাদের বাড়ি যেতে বারণ করেছে। করেও 'সত্যি' বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দোয়েলটা এখন আর ডাকছে না নিশ্চয়ই। সঙ্গীকে নিয়ে বাসায় ফিরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

সংসারের কূলে বসেও যেন অকূলে ভাসছি। নৌকার ছইয়ের ভিতরে ছোট একটি হ্যাজাকের আলো ঝুলছে মাথার ওপরে। আলো ঝলকানো ছোট একটি ঘরের মতো। মোটা নরম গদী পাতা। বালিশ কম্বল ছড়ানো। মাঘের শীতে সুখের ওম করা। সুগন্ধ ধূপকাঠি জ্বলছে নিরাপদ কোণে। উত্তরের পাটাতনে ইতিমধ্যেই একটি মাত্র বাঁশের ওপর ত্রিপল দিয়ে নিশ্ছিদ্র তাঁবু খাটানো হয়ে গিয়েছে। তবু পাছে উত্তরের হাওয়া আসে, তাই উত্তরের ছইয়ের মুখ-ছাটের দরজা বন্ধ। দক্ষিণের দরজা খোলা। সেখানে কাঠের উনোন জ্বলছে। রান্না বসেছে।

দক্ষিণের দরজার দুপাশে গঙ্গা যমুনা বসেছে। রতন মাঝিদের সঙ্গে বাইরে। রান্নার প্রয়োজনীয় দ্রব্য গঙ্গা যমুনা এগিয়ে দিচ্ছে। রতনের ওপরেই রান্নার ভার বটে। তবু গঙ্গা যমুনা মাঝে মাঝে উঠে যাচ্ছে। আবার এসে বসছে। ক্ষ্যাপাবাবা বসেছেন মাঝামাঝি জায়গায়। আমি তাঁর মুখোমুখি। ভাটার টানে নৌকা একেবারে স্থির থাকতে পারে না। টানের সঙ্গে

অল্প ঢেউয়ে, নৌকা মৃদু মৃদু দুলছে। ক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে আমার কথা চলছে।

আমার কথা শুনে ক্ষ্যাপাবাবাও দুলছেন, আর নিঃশব্দে হাস্য করছেন, 'গৌরহরি কেবল ওইটুকুনি বলেছে? আমার শ্যামা আছে, আমি সাপ গায়ে জড়িয়ে থাকি। আমার মন্দিরে বলি হয় না। শ্যামাক্ষ্যাপা নামও বলেছে। কিন্তু আসল কথাগুলোই তো বলে নি। আমি মদ ভাঙ গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকি, রূপসী যুবতী মেয়েদের নিয়ে র‍্যালা করি, এ সব কি বলেছে?'

ঠোঁটে হাসি, চোখে কৌতুক, গঙ্গা যমুনা ক্ষ্যাপাবাবার দিকে দেখছে। মাঝে মাঝে আমার দিকে। গঙ্গা যমুনা রূপসী নিঃসন্দেহে। গৌরাঙ্গী গঙ্গার মুখ একটু গোল, পুষ্ট ঠোঁট, ভাসা চোখ, টিকলো নাক। যমুনার মুখ ঈষৎ লম্বা, টানা চোখ, কচি আমপাতা রঙ। বাকি সবই একরকম। তবু, গঙ্গার স্বাস্থ্যে দোহারা গড়ন। যমুনা সেই তুলনায় একহারা দোহারার মাঝামাঝি। বয়স অনুমান বৃথা। বিশেষ যুবতী, কাল যৌবন। বয়সের হিসাব সেই কালের গভীরে বহে।

ক্ষ্যাপাবাবা নিঃসন্দেহে রঙ্গ করছেন। না হলে নিজের কথা এমন করে বলতেন না। বললাম, 'না, তা বলেননি।'

ক্ষ্যাপাবাবা ভ্রূকুটি অবাক চোখে একবার দেখলেন গঙ্গার দিকে। আর একবার যমুনার দিকে। 'শুনেছিস তোরা? গৌরহরি কেমন লোক বুঝতে পারছিনে।'

গঙ্গা যমুনা চোখাচোখি করে হাসলো। একবার আমার দিকে দেখে, আবার ক্ষ্যাপাবাবার দিকে। তাঁর চোখে সেই ভ্রূকুটি বিস্ময়। আমাকে বললেন, 'ডাকাতের দল পুষি, লুটে পুটে খাসা আরামে আছি, সে-সব কিছুই বলেনি?'

আমি হেসে মাথা নাড়লাম। ক্ষ্যাপাবাবার চোখে তেমনি ভ্রূকুটি বিস্ময়। একটু বা হতাশা, 'ও গঙ্গা, অইরে যমুনে শুনছিস? গৌরহরিটা কোনো খবর রাখে না, খালি হাঁকডাক করে।'

বাইরে থেকে রতনের গলা ভেসে এলো, 'গোরাবাবুর ভারি কান, বোকা মানুষ। কিছু জানে শোনে না।'

'এই হারামজাদা, তুই চুপ কর।' ক্ষ্যাপাবাবা ধমকে উঠলেন। চোখে ঝিলিক হানছে।

গঙ্গার স্বরে বীণার ঝংকার। যমুনার স্বরে মন্দিরা। হাসি চাপতে গিয়ে মুখে হাত। ক্ষ্যাপাবাবা চিন্তিত মুখে বললেন, 'গোটা ত্রিবেণীর লোক যা জানে, গৌরহরি তা জানে না? তা হলে তো তাকে একদিন আশ্রমে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যেতে হয়।'

'কেন?' গঙ্গার ভাসা কালো চোখে অবাক দৃষ্টি।

ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'তাকে একবার আমার সব কিছু দেখিয়ে আনতে হয়।'

'কারোকে দেখিয়ে আনবার কী দরকার বাবা?' যমুনা একবার চকিত কটাক্ষে আমাকে দেখলো, 'উনি তো যাচ্ছেন, কাগজেপত্রে লিখে দিলেই সবাই সব জানতে পারবে।'

ক্ষ্যাপাবাবা টপ্পা অঙ্গে বড় দানায় বেজে উঠলেন, 'বাহ্, বেশ বলেছিস। সাধে কি আর বলি, মায়ের ডাকিনী যোগিনীগুলো আমার ভালোই জুটেছে।'

"ও, মেয়েরা এখন ডাকিনী যোগিনী হয়ে গেল?' গঙ্গা ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে ঠোঁট ফোলালো।

ক্ষ্যাপাবাবা আমার দিকে তাকালেন, 'রাগ দেখেছো? আসলে যে সবাই এক, তা বোঝে না। তখন তোমাকে চারহেতে ল্যাংটা মেয়ের কথা বলছিলাম না? এতখানি জিভ বের করা। সে আর এরা সবাই তো এক। নামে আলাদা। বোঝে না, কিছু বোঝে না। আচ্ছা, আয় দুজনেই কাছে আয়।'

ডাক শুনেই গঙ্গা যমুনা ক্ষ্যাপাবাবার কোলের কাছে এগিয়ে এলো। তিনি দু হাতে দুজনের বাঁহাত ধরে তুলে নিজের মাথায় রাখলেন, 'নে, এবার রেগে যা খুশি তাই বল, শাপশাপান্ত কর। কিন্তু মিথ্যে বলি নি। ডাক যোগের কথা যারা জানে না, তারা ডাকিনী যোগিনী বুঝবে কেমন করে?'

গঙ্গা যমুনা দুজনেই ক্ষ্যাপাবাবার পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে দিল। ক্ষ্যাপাবাবা হাসছেন, কিন্তু চোখের কোণে জল। এ রহস্য বোঝা আমার কর্ম না। ক্ষ্যাপাবাবা দুজনের হাত দুটি ধরে নিজের বুকে কয়েক মুহূর্ত রাখলেন, 'যা, নিজেদের জায়গায় গিয়ে বোস। নইলে ছেলেটা ভাববে, এ আবার কী ন্যাকামি শুরু হলো।'

দুজনেই সরে বসলো। গঙ্গা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি তাই ভাবছেন?'

'তা কেন ভাববো।' আমি হেসে বললাম, 'আমি দেখলাম, মেয়েদের অভিমান, বাবার আদর।'

গঙ্গা যমুনা ক্ষ্যাপাবাবার দিকে তাকালো। তিনি ওদের দিকে হেসে তাকিয়ে ঘাড় ঝাঁকালেন, 'ও তো ধর্মে নেই, অথচ ও রকম ভাবাটাই ওর ধর্ম।' আমার দিকে মুখ ফেরালেন, 'হ্যাঁ, শাক্ত শক্তি সাধন নিয়ে যেন কী কথা হচ্ছিল?'

বললাম, 'আমার কথার জবাবে আপনি বলছিলেন, আপনি শাক্ত। শক্তি সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।'

'পৃথিবীতে সব থেকে কঠিন সাধনা।' ক্ষ্যাপাবাবার উজ্জ্বল চোখের,

দৃষ্টি আমার দিকে, 'শক্তি তত্ত্ব বিষয়ে কিছু জানা আছে নাকি ?'

এই মুহূর্তে আমার অনেক কথা মনে পড়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠলো কিছু মুখ। কিন্তু সে-সব কথা আমি বলতে চাই না। হেসে বললাম, 'কেমন করে জানবো বলুন। আমি তো অনধিকারী।'

'অনধিকারী !' ক্ষ্যাপাবাবার দৃষ্টি তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো, 'অনধিকারী ? এ কথা কেন বললে ? কেন অনধিকারী, কিসের ?'

বলেও ফ্যাসাদ করলাম দেখছি। আমি হেসেই বললাম, 'সব বিষয়ে সকলের জানার অধিকার নেই, তাই বলছি—।'

'বুঝেছি, বুঝেছি বাপ আমার, তোমার কথা বুঝেছি।' ক্ষ্যাপাবাবা আমাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'কিন্তু শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে যে সকলের জানার অধিকার নেই, এ কথাটি কোথা থেকে জানলে ?'

বললাম, 'শুনেছি।'

'কার কাছে ? কোথায় ?' ক্ষ্যাপাবাবার দৃষ্টি আমার চোখের দিকে।

অই হে, আমার অবস্থা দেখছি, এঁড়ে গরু, না টেনে দো। এঁড়ে গরুকে কি দোহন করা যায় ? যতো এড়িয়ে যাই, পা ততোই ফাঁদে। বললাম, 'প্রথম শুনেছিলাম আমার বাবার কাছে।'

'তার মানে, তুমি শাক্ত পরিবারের ছেলে।'

'আমার বাবা শাক্ত ছিলেন।'

'বুঝলাম। তারপরে কার কাছে শুনেছো ?'

আমি চুপ করে রইলাম। অস্বস্তিতে হাসলাম। ক্ষ্যাপাবাবা গঙ্গা আর যমুনার দিকে একবার দেখে ঘাড় ঝাঁকালেন, 'তার মানে বলতে চাও না। বেশ। কী শুনেছো ?'

আমি মুখ ফিরিয়ে গঙ্গা আর যমুনার দিকে দেখলাম। ওদের চোখ আমার দিকে। ক্ষ্যাপাবাবার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, 'শুনেছি শক্তিতত্ত্ব গোপন তত্ত্ব। কেবল সাধক সাধিকারাই জানেন।'

'ও গো তোরা শোন, ও তো ধর্মে নেই, কিন্তু এমনি কথার কথা বলে।' ক্ষ্যাপাবাবার গলার স্বরে আবেগ, 'আর একটু খোলসা করো বাপ।'

বললাম, 'আর তো আমার খোলসা করার কিছু নেই। আমি তো অনধিকারী, গোপন তত্ত্ব আমার জানবার কথা নয়। তবে—।' নিজের কাছেই ঠেক খেলাম। ঠিক জায়গায় থামতে জানি না।

'বলো, তবে ?' ক্ষ্যাপাবাবার স্থির দৃষ্টি আমার দিকে।

বললাম, 'নারীর সম্মানের কথা শুনেছি, আর কোথাও যা শুনিনি, পড়িনি।'

'কী শুনেছো ?' ক্ষ্যাপাবাবার গলা যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে।

বললাম, 'শুনেছি নারী ত্রিলোকের জননী, তিনিই জগতের স্বরূপিণী,

তিনি বিদ্যা, তিনি পরম ব্রহ্ম, তিনিই শক্তির আধার। তাঁকে সর্বদা সেবা করা উচিত।'

ক্ষ্যাপাবাবার হা হা হাসির স্বরে এবার যেন পাখোয়াজের উচ্চগ্রুত তালধ্বনি। চোখে জল। প্রায় ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে এসে আমার দু কাঁধে হাত দিলেন, 'আবার বলো, আবার বলো।'

আবেগের অনুভূতিটা কি সংক্রামক ? বললাম, 'শুনেছি, যিনি শক্তি, তিনিই প্রেম। প্রেমই শক্তির আধার।'

ক্ষ্যাপাবাবার গোঁফদাড়িসুদ্ধ মুখ আমার মুখের ওপরে। দু হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। কথা বলতে পারছেন না। তাঁর চোখের জল আমার গালে লাগছে। আমার চোখ পড়লো গঙ্গা যমুনার দিকে। দেখছি, ওদের চোখেও জল, দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। দক্ষিণের মুখ-ছাটের দরজার সামনে রতন এসে বসেছে। কিন্তু গোঁফদাড়িতে বড় গোল। ক্ষ্যাপাবাবা রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'ওগো তোরা শোন। ও তো ধর্মে নেই। এমনি করে বলে।' বলেই সরে গিয়ে, আমার দিকে চোখ রেখে হাঁকলেন, 'রতন।'

'বাবা।' রতন জবাব দিল।

ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'এটাকে গঙ্গায় চুবিয়ে নিয়ে আয়, নইলে কথা বেরোবে না।'

আমি রতনের দিকে তাকালাম। রতন আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'রান্না হয়ে গেছে বাবা। আগে খাইয়ে নিই, তারপরে চুবোব।'

'হারামজাদা !' ক্ষ্যাপাবাবা হেসে বললেন। তাঁর চোখের কোলের জল, গোঁফদাড়িতে চিকচিক করছে, 'তবে দে, খেতে দে। সবাই একসঙ্গে বোস।'

সুগন্ধি চাল আর ভাজা মুগের ডালের খিচুড়ির গন্ধ নাকে লাগছে। এখনও কিছু ভাজা হচ্ছে। তার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ পাচ্ছি। গঙ্গা যমুনা উঠে গেল দক্ষিণের পাটাতনে। সেখানেও, ছইয়ের ওপর থেকে গলুই পর্যন্ত বাঁশ রেখে ত্রিপলের তাঁবু খাটানো হয়েছে। দেখতে দেখতে জায়গা হয়ে গেল। ঝকঝকে থালা-বাসন দেখে ভেবেছিলাম, খাদ্য পরিবেশন ওতেই হবে। কিন্তু দেখছি, সবলের জন্য কলাপাতা। মাঝিরা সব এক পাশে গিয়ে বসেছে। গঙ্গা আর যমুনা পরিবেশন করলো। গরম খিচুড়ির মধ্যে আলু আর কপি। বেগুন আর বড়ি ভাজা। আমি খাবারে হাত দেবার আগে জিজ্ঞেস করলাম, 'সকলের যে একসঙ্গে বসার কথা ?'

গঙ্গা যমুনা চোখাচোখি করে হাসলো। যমুনা আরও দুটি পাতা নিজেদের সামনে পেতে নিল। গঙ্গা বললো, 'আপনারা আর একটু এগোন, তারপরে আমরা বসছি।'

ক্ষ্যাপাবাবাই সব থেকে কম খেলেন। সব শেষে নলেন গুড়ের মাথা সন্দেশ আমাদের পাতে দিয়ে গঙ্গা যমুনা নিজেদের পাতায় খিচুড়ি নিল। একজন

মাঝি নৌকার ধারের ত্রিপল তুলে ধরলো। আর একজন জলের বালতি থেকে ঘটিতে জল তুলে হাতে ঢেলে দিল। রতন বাইরে রইলো, আমি ক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে ছইয়ের ভিতরে এসে বসলাম। ধূমপানের নেশাটা তীব্র হয়ে উঠলো। পকেটেই রয়েছে। বের করতে ভরসা পাচ্ছি না। কিন্তু থাকতেও পারছি না। উত্তরের পাটাতন দেখিয়ে বললাম, 'আমি একটু ওদিকে যাবো?'

'কেন?' ক্ষ্যাপাবাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'বাহ্যে, পেচ্ছাব করবে?'

এই মুহূর্তেই সেই বেগ নেই। পরে নিশ্চয় আসবে। বললাম, 'না, মানে—আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি একটু সিগারেট খাবো।'

'তার জন্যে ওখানে যাবার কী দরকার? আমার সামনেই খাও।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'আমাকেও একটা দাও।'

গঙ্গার মুখ দক্ষিণের ছইয়ের দরজায়, 'বাবা।'

'না, বাবা বাবা করিস নে। আজ আমার নিয়ম ভঙ্গ।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে, হেসে হাত বাড়ালেন।

আমি গঙ্গার দিকে একবার দেখে, ক্ষ্যাপাবাবার হাতে একটি সিগারেট দিলাম। তিনি সিগারেট নিয়ে গোঁফে হাত বোলালেন। সিগারেট দুই আঙুলে ধরে ঠোঁটে চাপলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কি ধূমপান বারণ?'

'বারণ আমার কিছু নেই, সবই ছেড়েছি।' ক্ষ্যাপাবাবা চোখের পাতা আধবোজা করে বললেন, 'সবই ছেড়েছি। মদ ভাঙ গাঁজা মাছ মাংস—সব। বিকেল থেকে তো দেখলে। পুজো আহ্নিক কিছু করতো দেখেছো?'

আমি মাথা নাড়লাম। তিনি বললেন, 'বিশ বছর আগে ও সব পাট চুকেছে। এখন শুধু বাজনা বাজাই, সাপ খেলাই আর ভিক্ষে করি। সংসারটা অনেক বড় তো। চালাতে পারিনে। দাও, আগুন দাও।'

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তাঁর সিগারেটে ধরলাম। তিনি লম্বা টান দিলেন। আমিও সিগারেট ধরালাম। গঙ্গা এগিয়ে এসে একটা মাটির গেলাস আমাদের সামনে রাখলো। যমুনা আর রতনও ভিতরে এসে বসেছে। ছইয়ের মুখ-ছাটের দরজা বন্ধ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার তো আশ্রম, সংসার কিসের?'

ক্ষ্যাপাবাবার মুখ থেকে ধোঁয়া গোঁফদাড়িতে ছড়িয়ে পড়লো, 'আশ্রম না কাঁচকলা। সংসার, সংসার। এই যে দেখছো তিনজন। এ রকম অনেক ছেলে মেয়ে নিয়ে আমার সংসার। আমি হলাম কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। একগাদা ছেলে এখনও ঘাড়ের ওপর। তোদের ক'টাকে পার করেছি গঙ্গা?'

'কুড়ি বছরে সাঁইত্রিশটা।' গঙ্গা হেসে জবাব দিল।

ক্ষ্যাপাবাবা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে হাসলেন, 'কুড়ি বছরে সাঁইত্রিশটা মেয়েকে পাত্রস্থ করেছি। এখনও গোটা বারো চৌদ্দ আছে। তার

মধ্যে এই পেত্নী দুটোও।' বলেই মস্ত জিভ কাটলেন, 'ইস, ছি ছি ছি! তখন ডাকিনী যোগিনী বলেছি, এখন আবার পেত্নী।'

যমুনা বললো, 'দু চক্ষের বিষ যারা, তাদের আর কী বলা যায়।'

আমার মুখ ফসকেই বেরিয়ে গেল, 'আসলে রূপসী মেয়েদের বাবারা মনে মনে খুব অহংকারী হন, লোককে শোনাবার জন্য অন্য রকম কথা বলেন।'

'শোন্ শোন্, ও তো ধর্মে নেই, কিন্তু এই রকম করে বলে।' ক্ষ্যাপাবাবা হেসে আমার দিকে তাকালেন। দুষ্টু ছেলের মতো চোখে ঝিলিক হেনে, গলা খাটো করে, ঝুঁকে বললেন, 'চোখে ধরবার মতো রূপ আছে, না?'

আমি ঠেক খেয়ে গেলাম। মনে সন্দেহ। এ জিজ্ঞাসার পিছনে, আমার প্রতি কোনো কটাক্ষ নেই তো? গঙ্গা আর যমুনার দিকে তাকালাম। আমার এ তাকানোটাও উলটো তালে বাজলো। গঙ্গা আর যমুনা খিলখিল করে হেসে উঠলো। বুদ্ধিভ্রংশের বিপাক। কিন্তু আমি রূপ যাচাই করার জন্য তাকাই নি। নিজেকে স্ববশে টানলাম, বললাম, 'তা তো আছেই।'

'বাবার মন রাখছেন?' গঙ্গার বাঁকা ঘাড়ে, চোখের দৃষ্টিও যেন কিঞ্চিৎ বাঁকা।

বললাম, 'না, তা হলে ওঁর অহংকারের কথা বলতাম না।'

'বলো বলো, ছুঁড়ি দুটোর চুলের ঝুঁটি নেড়ে দিয়ে বলো।' ক্ষ্যাপাবাবা যেন ক্ষ্যাপা স্বরে ধমকে বললেন, 'তোমাকে বাজিয়ে দেখতে চায়।'

গঙ্গা যমুনার উচ্ছল হাসির সঙ্গে রতনের গলাও ডুগির শব্দে বাজলো। ভুলে যাচ্ছি, ত্রিবেণীর ঘাটে আছি। ভাটার ঢলের জলে ভাসে নৌকা। এখনও হয়তো শ্মশানে চিতা জ্বলছে। মহাশ্মশানের চিতা তো নেভে না। নদীর মাঝখানে ভাসছে চরের সংসার। বাইরে অন্ধকার রাত্রি, তার মাঝখানে এই হাসির শব্দে যেন একটা অলৌকিকতার ধ্বনি। ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'অবে, যমুনে মিথ্যে বলে নি। দু চক্ষের বিষ, এগুলোকে এখন বিদেয় করতে পারলে বাঁচি।' যমুনার দিকে আঙুল দেখালেন, 'এটাকে যখন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তখন পাঁচ বছর বয়স। আর ওই গঙ্গে—ওটাকে পেয়েছিলাম তিন বছরের। রতনটাকে তো কে বছর খানেকের ফেলে পালিয়ে গেছলো। নাম যা শুনছো, সবই আমার দেওয়া। বিশ বছর ধরে এই করছি। তা হলেই বোঝ, এত গণ্ডা গণ্ডা ছেলে মেয়ে যার, তার ভিক্ষে করা ছাড়া উপায় কী? কপালের বরাত জোর, ভিক্ষেটা জুটে যায়। লোকে অবশ্য বলে, ডাকাতের দল পুষি। নইলে সাপ নাচিয়ে বাজনা বাজিয়ে হেসে খেলে আছি কেমন করে। তার মধ্যে মেয়েদের মানুষ করা, বিয়ে দেওয়া আছে। ছেলেদের কাজ যোগাড় আছে, চিরকাল তো পুষতে পারি নে। তবে হ্যাঁ, নদীয়ায়, বর্ধমানে, চব্বিশ পরগণায় ভিক্ষের দান কিছু ছিটেফোঁটা জমি পেয়েছি। কিছু ছেলেকে সে-সব জায়গায় আশ্রম গড়তে লাগিয়েছি। সে-সব ছেলের চাকরি বিয়ে-থা হবে

না, ওদেরও এই রকম সংসার চালাতে হচ্ছে। আশ্রম তো কথার কথা, সবই আসলে সংসার। সংসারের যজ্ঞকাণ্ড।' অনেকক্ষণ কথা বলে থামলেন। চোখ বুজে, সিগারেটে মুঠি পাকিয়ে টান দিলেন।

আমার চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠলো। ক্ষ্যাপাবাবার আসল নাম যা-ই হোক, বিশ বছর আগে এক রকমের সাধক জীবন কাটিয়েছেন। সে-ইঙ্গিত পেয়েছি তাঁর কথা থেকেই। 'মদ ভাং গাঁজা মাছ-মাংস'-এর উল্লেখ একটা দিক নির্দেশ করে। সে কি তাঁর শক্তিসাধনার পঞ্চ-ম-কার? তারপরে আর এক কর্ম সাধনা। বুঝতে অসুবিধা নেই, অনাথ ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর আশ্রম। বরাত জোরে ভিক্ষা জোটে। দাতার সংখ্যা তাহলে কম না।

অতঃপর শোবার ব্যবস্থা। ছইয়ের মধ্যে এক পাশে ক্ষ্যাপাবাবা আর আমি। অন্য পাশে গঙ্গা যমুনা। রতন উত্তরের তাঁবু খাটানো পাটাতনে। সেই জায়গাটা আমি চেয়েছিলাম। ক্ষ্যাপাবাবা উল্টো ভেবে, রতনকে দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, নৌকার গায়ে কোথায় সিঁড়ি পাতা আছে। প্রাকৃতিক কর্মের ব্যবস্থা। তারপরেও যখন বললাম, আমি তাঁবুর নিচেই ভালো থাকবো, তিনি না-মঞ্জুর করলেন, 'বাপ আমার, তুমি ডেকে আনা অতিথি। তুমি থাকবে আমার কাছে।'

শোবার আগে বললেন, 'গঙ্গে যমুনে, এবার একটু গুনগুন করে একটা কিছু ধর।'

গঙ্গা যমুনার স্বর শুনে মনে হয়েছিল, ওরা গান জানে। সেই প্রমাণটাই এখন মিললো। ছইয়ের ভিতরে এখন উষ্ণ অন্ধকার। প্রথম কোনো স্বর গুনগুনিয়ে উঠলো। তারপর বীণাস্বরে প্রথম শোনা গেল:

'এ কোন নগরে নামিয়ে গেলে ভাই।'
মন্দিরা স্বর যোগ দিল,
'পাটনী হে, আঁধারে পথের দিশা নাই।
এ বাঁকে পথ ও বাঁকে পথ
ঘুরপাক খাচ্ছে আপন মত
যে পথে যাই ধাঁধায় ফিরি এক ঠাঁই
বলেছিলে দেখিয়ে দেবে
কী খেলা চলছে ভবে
ছ' পথ ঘুরে দশের মোড়ে কিছু দেখি নাই।
বিজলি চমক জগত হেরি
ধড়ে মুণ্ডে গড়াগড়ি
প্রকৃতি প্রসূতি অঙ্গে জন্ম দিচ্ছে নিরন্তরেই।'

আমার কাছ থেকেই ক্ষ্যাপাবাবার রুদ্ধ স্বর শোনা গেল, 'হে মহাকাল। হে মহাকালী।'......

গান আর শোনা গেল না। ভিতরে স্তব্ধতা। আমি চোখ বুঁজে শুয়ে কেবল দুটো কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, 'মহাকাল নিরন্তর' ধ্বংস সৃষ্টি নিরন্তর।......

পরের দিন যখন ঘুম ভাঙলো, তখন একটা বিস্মরণের বিভ্রান্তি। উঠে বসে চোখ কচলে তাকিয়ে দেখলাম, উত্তরের পাটাতনে রোদ। তাঁবু নেই। সেখানে ক্ষ্যাপাবাবাকে ঘিরে বসে গঙ্গা যমুনা রতন। সকলের হাতেই ধূমায়িত চায়ের পাত্র। রকমারি রঙের পাথরের গেলাস। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। প্রথমেই দৃষ্টি বিনিময় হলো ক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে। তিনি এদিকে মুখ করে বসেছিলেন। বলে উঠলেন, 'উঠেছে রে, উঠেছে।'

সবাই উঁকি দিয়ে দেখলো। আমি বাইরে এলাম। গায়ে আমার অবিন্যস্ত কোঁচকানো ধুতি পাঞ্জাবি। আয়না বিনে নিজের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি না। সকলের দিকে তাকিয়ে দিনের প্রথম হাসিটি নিবেদন করতে গিয়ে ঠেক! এ আবার কোন্ জায়গা? ত্রিবেণীর ঘাট কোথায়? পশ্চিমের উঁচু পাড়ে এখনও ভাটার ঢল, পলি কাদা। তার ওপরেই আঁশশ্যাওড়া কালকাসুন্দের জঙ্গল। আরও উঁচুতে গাছপালায় নিবিড়। পূবে তাকিয়ে দেখি, অনেক দূরে একটি ক্ষীণ চরের রেখা। তারপরে গ্রাম।

'চেনা জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না?' গঙ্গা হেসে উঠে বললো। এমন একটি আসরের মাঝে না হলে, এ জিজ্ঞাসাটাই শোনাতো, 'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'উঠে যদি দেখতো, চেনা ঘাটে রয়েছে, অমনি বাপ আমার তলপি তলপা গুটিয়ে ওখান থেকেই পালাতো।'

সবাই হেসে উঠলো। ক্ষ্যাপাবাবা সত্যি বললেন, কি ভুল বললেন জানি না। কিন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কোন্ জায়গা, কখন এলাম?'

'এটা হলো তোমার ডুমুরদহের সীমানা।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'কুন্তী নদীর মুখটা ছাড়িয়ে এসেছি। কাল রাত এগারোটা নাগাদ জোয়ার এসেছে। রাত দুটো নাগাদ নৌকো ছেড়ে এক ঘণ্টার টানে এ পর্যন্ত এসেছে। এখন আবার ভাটা। যাও, নিচে নেমে বাঁদিকে জঙ্গলে একটু ঘুরে এসো। মুখ-টুখ ধোও। তারপরে চা খাবে।'

তার মানে, সকলেরই নিচে নেমে বাঁদাড় জঙ্গল ঘোরা, মুখ ধোয়া সারা। যাকে বলে প্রাতঃকৃত্যাদি। গঙ্গা উঠে দাঁড়ালো, 'আপনার কাঁধের ঝোলা চাই তো?'

এত সহজে বুঝলো কেমন করে? দাঁত ঘষার ব্রাশ আর মাজনটা চাই। আমি ছইয়ের মধ্যে ঢুকতে গেলাম। গঙ্গা বললো, 'দাঁড়ান, আমি এনে দিচ্ছি।'

এগিয়ে এসে, আমার পাশ কাটিয়ে ছইয়ের মধ্যে ঢুকলো। অস্বস্তি বোধ করে লাভ নেই। দেখলাম, ছইয়ের ওপরে আমার ভেজা জামাকাপড় মেলে ছড়ানো।

ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'ব্যস্ত হয়ো না। অতিথির সেবার ভার ওদেরই। তবে মনে রেখো, এবেলা আর নৌকোয় রান্না খাওয়া নেই। যতো দেরিই হোক, সেই একেবারে আশ্রমে গিয়ে। তবে হ্যাঁ, কিছু মুড়ি মুড়কি মিষ্টি এখন পাবে। এখন ভাটি ঠেলতে ঠেলতে যাওয়া, আর থামা নেই। অবশ্য, ইচ্ছে হলে একবার ডুমুরদায় নামতে পারো।'

'আবার ডুমুরদায় থামা কেন বাবা?' যমুনা তার খোলা চুলের গোছা পিছনে টেনে বললো।

ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'বলিস্ কী গো যমুনে? এ জায়গা যে সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের সাধনভূমি, ঠাকুরের গ্রাম। শ্রীরামাশ্রম যদি ও দর্শন করতে চায়, করতে পারে। তা ছাড়া আছে শ্রীশ্রীউত্তমানন্দের উত্তমাশ্রম। ডুমুরদা তো সহজ জায়গা নয়!'

শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের নাম শুনেছি, দর্শন পাই নি। ডুমুরদহ তাঁর গ্রাম, এবং সাধনভূমি, এ কথা জানা ছিল না। সাধক উত্তমানন্দ বা তাঁর আশ্রমের কথাও শুনি নি। বরং ডুমুরদহ নামের সঙ্গে, বিশে ডাকাতের কথা শুনেছি। তা হলে আর এ গ্রাম সহজ জায়গা কেমন করে হবে। একদা যে গ্রামের ডাকাতের নাম শুনলে, মানুষের অন্তরাত্মা কাঁপতো, এখন সেই গ্রামের নামে অন্তরে ভক্তির ধারা বহে। কালের গতির এমনি ধারা। গত রাত্রের গঙ্গা যমুনার গানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

গঙ্গা আমার ঝোলাটা নিয়ে, ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো, 'কিন্তু বাবা, উনি এখন ডুমুরদায় নামলে আমাদের যেতে দেরি হয়ে যাবে না?'

আমারও সেই কথা। একসঙ্গে সব মেলে না। বললাম, 'এখন যেখানে যাত্রা, সেখানেই যাই। ফেরার পথে ঘুরে যাবো।'

'তোমার ইচ্ছে বাবা।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'ডুমুরদার মাহাত্ম্য জানিয়ে দিলাম, একবার ঘুরে যেও।'

গঙ্গা আমার দিকে ঝোলা বাড়িয়ে দিল। আমি ঝোলা নিয়ে বললাম, 'ডুমুরদার বিশে ডাকাতের কথা শুনেছি।'

'গেলে এখনও তার বাড়ি দেখতে পাবে।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'সেকালের বড়লোক জমিদার মানেই ডাকাত।'

আমি দাঁতের বুরুশ আর মাজন বের করলাম, হেসে বললাম, 'আবার ইংরেজরা দরকার বুঝলে, অনেককে ডাকাত বানিয়ে দিতো। এ রকম এক ডাকাতের নাম ছিল বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন।

ইংরেজরা তাঁর মাথার দাম ঘোষণা করেছিলেন দশ হাজার টাকা। অবিশ্যি পরে দলের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই, সৈন্য সামন্ত নিয়ে এক সাহেব তাঁকে ধরেছিলেন। তবে তিনি ডুমুরদহের বিশে ডাকাত বলে শুনিনি।'

'আহা, যদি অমন ডাকাত হতে পারতাম।' ক্ষ্যাপাবাবা গোঁফ ডুবিয়ে চায়ের পাত্রে চুমুক দিলেন।

গঙ্গা যমুনার মধ্যে চোখে চোখে কথা ও হাসি। তারপরে গঙ্গার বয়ান, 'আপনাকে তো অনেকে ডাকাত বলেই।'

'কিন্তু সৈন্য সামন্ত নিয়ে কেউ ধরতে এলো না।' ক্ষ্যাপাবাবার স্বরে যেন আফশোস্।

গঙ্গা বললো, 'কেন, আমরাই তো ডাকাতকে ধরে রেখেছি, পালাবেন কী করে?'

ক্ষ্যাপাবাবা ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে বললেন, 'রাক্ষুসী।' বলেই জিভ কেটে চোখ বড় করলেন, 'ইস্, ডাকিনী যোগিনী পেত্নী, শেষে রাক্ষুসী! ছি ছি, এবার গঙ্গাজলে মুখ ধুতে হবে।'

আমি গঙ্গা যমুনার মুখের দিকে তাকালাম। এখন তাদের রোদ ঝলকানো মুখে অভিমানের ছায়া নেই।

যমুনা হেসে বললো, 'যা খুশি তাই বলুন, ডাকাতকে জেলে তো পুরেছি।'

এ প্রসঙ্গে আমার মুখ খোলবার কথা না। কিন্তু মুখ ফস্কেই বেরিয়ে গেল, 'সে জেলের নাম কি? মায়াডোর?'

'অই, অই শোন, ও তো ধর্ম জানে না, কিন্তু এমনি করে বলে।' ক্ষ্যাপা-বাবা চোখের তারা ঘুরিয়ে হাসলেন।

গঙ্গা যমুনা খিল খিল হাসিতে বাজলো। আমি দাঁতে বুরুশ ঘষতে শুরু করলাম।

গুপ্তিপাড়া আর কালনার মাঝামাঝি জায়গায় নৌকা এসে যখন থামলো, সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে গিয়েছে। হাতের ঘড়ির কাঁটা বেলা দুটোর সীমানা ছাড়িয়ে। খবর বোধ হয় আগেই ছিল। ঘাটে কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল। পাড়ে উঠে একটি ছোট গ্রাম। তার ভিতর দিয়ে কয়েক মিনিটের পথ হেঁটেই আশ্রমের সীমানা। প্রথমেই চোখে পড়ে মন্দির। ভিতরে মন্দির সংলগ্ন নাটঘর। নাটঘরের দু'পাশে ঘর। একপাশে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সামনে বাগান। নানা বয়সের মেয়ে পুরুষ কাজে ব্যস্ত।

বিকালের দিকে আশ্রমের চৌহদ্দি আর ছেলেমেয়েদের বাসস্থান দেখলাম। সীমানার চৌহদ্দির মধ্যে বিরাট বাগান, একটি পুকুর। কিন্তু পানীয় জলের জন্য দুটি টিউবওয়েল রয়েছে। মাঝখানে মন্দিরকে রেখে একদিকে মেয়েদের

বাসস্থান। বিপরীত দিকে ছেলেদের। কিন্তু ছেলেমেয়েরা ছাড়াও বয়স্ক মেয়ে পুরুষের সংখ্যাও ডজনখানেক হবে।

মন্দিরের প্রকোষ্ঠে চতুর্ভুজা কালীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। নাটমন্দিরের উত্তরের একটি ঘরে ক্ষ্যাপাবাবা থাকেন। পাশের ঘরে আমার আশ্রয় জুটলো। আমার দায়দায়িত্ব সবই গঙ্গা যমুনা আর রত্তনের ওপর। কিন্তু অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও দূরে সরে থাকলো না।

ক্ষ্যাপাবাবাকে ঘিরেই যেহেতু আশ্রম, সকলের ভিড়, অতএব নাটমন্দিরেই।

তিনদিন থাকতে হলো। কেননা, ক্ষ্যাপাবাবার বিধান, তেরাত্রি কাটিয়ে যেতে হবে। যজ্ঞকাণ্ড নিঃসন্দেহে। তবে, ক্ষ্যাপাবাবা বসলে, তিনি ঝাঁপি খুলে বসেন। আর সাপ কিলবিলিয়ে বেড়ায়। সৌভাগ্য তাঁকে ঘিরে, তাঁর গায়েই বেড়ায়। তবু কেমন গা সিরসির করে। ছেলেমেয়েদের সমবেত গান ছাড়া গঙ্গা যমুনার আলাদা গান একটি আকর্ষণের বিষয়। তার থেকেও বেশি, ক্ষ্যাপাবাবার হারমোনিয়ামের বাজনা।

দুটো দিন কেটে গেল, যেন নতুন জগতের বিচিত্র এক যজ্ঞক্ষেত্রে। ভোর-বেলাটা আশ্চর্য সুন্দর। মাঘের বুকে এখনই এখানে বসন্তের সাড়া জেগেছে। গাছে গাছে আমের বোল। কোকিলের স্বরে সপ্তমের রাগ। বাতাসে নানা ফুলের গন্ধ। পত্রহীন গাছে নতুন পাতার চিকচিক উঁকিঝুঁকি।

তৃতীয় দিন ভোরবেলা, নাটমন্দিরের সামনের বাগানে গঙ্গা দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে বললো, 'আসুন, এখনও একটা জায়গা দেখা আপনার বাকি রয়েছে বাবার অনুমতি কাল রাত্রে পেয়েছি। নইলে দেখাতে পারতাম না।'

'কোথায়?'

'কাছেই।'

নাটমন্দিরের বাগানের সামনে কয়েকটি ছোটখাটো পুরনো ঘর। আশে-পাশে গাছের ঝুপসি। এগুলো দর্শনীয় বলে মনে হয়নি। গঙ্গা সেই সব ঘরের আশপাশ দিয়েই ঘন ঝোপের মধ্যে এগিয়ে গেল। দেখছি, ওর বাসি চুল খোলা, পিঠে ছড়ানো। সামান্য শাড়ি জামা, নিতান্ত আটপৌরে ধরনে পরা। আশ্চর্য! এদিকটায় একবারও আসি নি। ক্রমে গাছপালা নিবিড় হয়ে এলো। ভোরের আলো এখানে এখনও ছায়াঘন অন্ধকার। চোখে পড়লো, চারদিকে লোহার শিকঘেরা একটি ছোট ঘর। তার পাশেই বিরাট গাছ। কী গাছ চিনতে পারলাম না। আমাদের সাড়া পেয়ে গাছে গাছে পাখিরা ত্রস্ত হয়ে পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে পালালো। গঙ্গা লোহার শিক ধরে দাঁড়ালো। আমি ওর পিছনে দাঁড়ালাম। ও ডাকলো, 'কাছে আসুন।'

আমি গঙ্গার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। গঙ্গা আমাকে বিশাল গাছের গুঁড়ি দেখিয়ে বললো, 'কুড়ি বছর আগে ঐখানে বাবার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। সচরাচর কারোকে এ জায়গা তিনি দেখাতে চান না।'

'কেন?'

'তিনি বলেন, লোকে মন্দির দেখবে, ঠাকুর দেখবে, এসব জায়গা সকলের দেখবার নয়। অবশ্য আপনার কথা আলাদা।' গঙ্গা হাসলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কি নিজে দেখাতে বলেছেন?'

'না, আমিই বাবাকে বলেছি।' গঙ্গা আমার দিকে তাকালো, 'না বললে, বাবা নিজে থেকে বলতেন না।'

আমি গাছটির দিকে তাকালাম। বট অশত্থ নিম চিনতে পারছি। বাকি শিকড় ও পাতা চিনতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কি পঞ্চমুণ্ডির আসন?'

'হ্যাঁ।' গঙ্গা শিক ধরে ধরে অন্য দিকে গেল।

আমি ওকে অনুসরণ করলাম। গঙ্গা বললো, 'আপনি মাঝে মাঝে এলে বাবা খুশি হবেন।'

'তখন হয়তো আপনি আর এখানে থাকবেন না।' আমি গঙ্গার দিকে তাকালাম।

গঙ্গা ওর ভাসা চোখে আমার দিকে তাকালো, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলো না। ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে সহজ ভাবেই বললো, 'তা বলা যায় না।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও মুখ ফিরিয়ে নিল। এখন ওর মুখে হাসি নেই। যেন নিশ্বাস আটকে আছে বুকের কাছে। মুখ না ফিরিয়েই বললো, 'বাবা অবশ্য আমার বিয়ের কথাই ভাবেন। আমিও ভাবি। ভেবে মনে মনে অনেক কল্পনা করি। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। ভয় হয়।'

'ভয়?'

'হ্যাঁ। চিরকাল আশ্রমে থাকবো, সেটাও যেন মানতে পারিনে। আবার বিয়ের কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয়, আমি আশ্রম ছাড়া কোথাও কারো কাছে থাকতে পারবো না।' গঙ্গা হাসলো, কিন্তু ওর গভীর ভাসা চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠলো। যেন বিশাল কালো শান্ত সরোবরের এক ধারে রোদের কিরণ।

আমি অবাক চোখে ওর দিকে তাকালাম। গঙ্গা আবার বললো, 'আমি আমার বাবা মা কারোকে চিনিনে। সংসার কেমন বুঝিনে। অথচ—।' থেমে গেল। আমার দিকে তাকালো। চোখের জলেই হাসতে গিয়ে, দৃষ্টিতে লজ্জা ফুটলো, 'অথচ আপনাকে বলতে সংকোচ নেই—আমার মতো একটা মেয়ের যে-কামনা বাসনা থাকা উচিত, আমার তাও আছে। কিন্তু আমি সেখানেও যেতে পারবো না।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো।

গঙ্গা তাহলে কোন্ জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে? একবার ওর

কথা শুনে কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়েছিল। আবার একবার মনে পড়লো। ওর দিকে তাকিয়ে আমার নিজেরই মন ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় ভরে উঠলো।

কিন্তু আমি নবকুমার না। ক্ষ্যাপাবাবা কাপালিক নন। ইতিমধ্যে যেটুকু শুনেছি, আর জেনেছি, অনুমান, যাকে বলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ, তা তাঁর ঘটেছে। সিদ্ধপুরুষ এখন অনাথ বালক বালিকাদের নিয়ে আর এক সাধনায় মেতেছেন। তাঁর সেই সাধনায়, গঙ্গা ওর নির্দিষ্ট পরিণতি জেনেও, এক গভীর সংকটের মুখোমুখি থমকে দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গাকে নিয়ে ব্যগ্র উৎকণ্ঠা কেবল ওর কথাগুলো শুনে। চিরাশ্রিত আশ্রম জীবন একদিকে, আর একদিকে কামনা বাসনা। তার মাঝখানে গঙ্গা দ্বিধাচারিণী। ওর জীবন-দিক্‌নির্ণয়ের কাঁটাটা কোন্ দিকে মুখ করে আছে?

গঙ্গা হঠাৎ সনিঃশ্বাসে হেসে উঠলো, 'আসুন, আপনি আবার সাত পাঁচ ভাবতে আরম্ভ করেছেন।'

ও পঞ্চমুণ্ডির আসন ঘেরা ভুমি বেষ্টনী লোহার শিক ধরে ধরে এগিয়ে গেল। আমি দেখলাম, ও যেন শিকের আড়ালে বন্দিনী হয়ে আছে। আমি ওকে অনুসরণ করলাম।

কিন্তু আমি ওকে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'ক্ষ্যাপাবাবা কি আপনার মনের কথা জানেন?'

'মুখ ফুটে কখনো বলি নি।' গঙ্গা লোহার শিকল ধরে, পায়ে পায়ে সেই বেষ্টনীকে পাক দিতে লাগলো, 'কিন্তু তিনি সবই বোঝেন। বুঝতে পারি, আমাকে নিয়ে তাঁর বড় দুশ্চিন্তা। মাঝে মাঝে রেগে উঠে বলেন, তোকে আমি সাপ দিয়ে খাওয়াবো। আবার কখনো আদর করে বলেন, ভাবিস নি। তার যখন সময় হবে তখন সে আপনি তোর কাছে ছুটে আসবে, তুইও ঠিক চলে যাবি।'

আমি গঙ্গার কয়েক হাত দূরে, ওর পিছনে পিছনে, সাধনভুমির বেষ্টনী লোহার শিকের গায়ে গায়ে চলছি, 'আর যমুনা?'

'ওর তো বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বাবার ভক্ত, কলকাতার এক ডাক্তারের সঙ্গে।' গঙ্গা না থেমে বললো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'যমুনার মত আছে?'

'আছে। ডাক্তারের সঙ্গে এখানে ওর কথা হয়েছে। তাঁকে ওর ভালো লেগেছে। দুজনেরই দুজনকে।' গঙ্গা লোহার শিক ছেড়ে দিয়ে ডানদিকে এগিয়ে গেল, 'আসুন, রোদে যাই।'

সিদ্ধক্ষেত্রের নিবিড় গাছপালার বাইরে, ছোট একফালি খোলা জমির সামনে এসে পড়লাম। রোদে যেন সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগলো। কেবল আরাম নয় একটা আচ্ছন্নতা থেকে যেন জেগে উঠলাম, 'আপনার বাবাই ঠিক বলেছেন, সে নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে আসবে। আমি বলি, যেন তাড়াতাড়ি আসে।'

গঙ্গা দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে আমার দিকে তাকালো। এখন ওর চোখে মুখে রহস্যের হাসি, 'কেউ যে আসেনি, তা তো নয়। অনেকে এসেছে, গেছে, আরও আসবে। ঠিক তাকেই চিনে নিতে পারবো কি?' আমার চোখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে, হঠাৎ শব্দ করে একটু হাসলো, 'নিজেকেই চিনতে পারিনি, তাকে চিনবো কেমন করে? জীবনটা সকলের একরকম নয়।' ও আবার পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করলো।

আমি কিছু বলতে গেলাম। পারলাম না। গঙ্গার কথাগুলোই আমার মস্তিষ্কের সীমানায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। ও চোখের আড়ালে চলে গেল। রৌদ্রালোকিত শূন্যভূমিতে দাঁড়িয়ে মনে হলো, আমার চোখের সামনে, সংসারের দিগন্ত এক অসীমে হারিয়ে যাচ্ছে।